

বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ শাসন

১৭৬০-১৯৪৭



সুদীপ্ত পোড়েল

বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ শাসন
১৭৬০-১৯৪৭

সুদীপ্ত পোড়েল

বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ শাসন

১৭৬০-১৯৪৭

সুদীপ্ত পোড়েল

প্রথম প্রকাশ

১৫ আগষ্ট ২০০৮

প্রকাশক

শুভ্রা পোড়েল

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ রাজা চন্দ্রবর্মা কর্তৃক খোদিত শুশুনিয়া পাহাড়ের শিলালিপি— বাঁকুড়ার ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত জেলার বহু ভাঙা-গড়ার নীরব ও ঐতিহাসিক সাক্ষী। মূল আলোকচিত্রটি প্রবীণ আলোকচিত্রশিল্পী অজিত মিশ্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত। প্রচ্ছদের অন্য ছবিটি হল বাঁকুড়া জেলার প্রথম সার্ভেয়ার (১৭৮০-৮৩) মেজর জেমস্ রেনেল সাহেবের।

সহযোগিতায়

দেবাশীষ লাহা

পৌর সদস্য

বাঁকুড়া পৌরসভা

মুদ্রক

হাইটেক লেসার প্রিন্টার

প্রতাপবাগান বাঁকুড়া

ফোন - ২৪১৩৮০

বিনিময়

কুড়ি টাকা

উৎসর্গ

৺রণজিৎ কুমার পোড়েল বাবা

শ্রীমতি ঝর্ণা পোড়েল মা

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসন কৃত্যকের কৃতী সদস্য শ্রী সুদীপ্ত পোড়েল, ডব্লু-বি-সি-এস, বাঁকুড়া ব্লক-১ এর সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক পদে আসীন থাকাকালীন ২২ শে মার্চ ২০০৪ থেকে ২২ শে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত বাঁকুড়ায় অতিবাহিত করেছেন। চাকুরির সুবাদে বাঁকুড়া জেলার একটি বৃহৎ অংশের মাটি ও মানুষ এবং ইতিহাস, সমাজ ও শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অন্তরঙ্গ ধারণা লাভের সুযোগ হয়েছিল। বাঁকুড়াকে ভালোবেসে তিনি বাঁকুড়া চর্চায় উদ্বুদ্ধ ও ব্রতী হন। তাঁর সক্রিয় উদ্যোগে ও সুযোগ্য সম্পাদনায় ২০০৭ -এর ২রা অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছে 'আত্মপরিচয় বাঁকুড়া ব্লক-১' নামে এক আকর গ্রন্থ। এ সংকলন গ্রন্থটি বাঁকুড়া ব্লক- ১ নামে পরিচিত এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, আর্থ-সমাজিক সাংস্কৃতিক, স্বায়ত্তশাসনমূলক বিবিধ বিষয়ে প্রামাণ্য আলোচনায় সমৃদ্ধ। গ্রন্থটি এ অঞ্চল সম্পর্কে জ্ঞান লাভের এক মূল্যবান উপাদান ভাণ্ডার। অত্যন্ত ব্যস্ততাপূর্ণ সরকারী কাজকর্মের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি শ্রীযুক্ত পোড়েল মহাশয়ের আগ্রহের ও অনুসন্ধিৎসার বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে বিচরণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি হলো 'বাঁকুড়া ব্রিটিশ শাসন ঃ ১৭৬০- ১৯৪৭'— নামক পুস্তিকাটি।

এ গ্রন্থে লেখক বাঁকুড়া জেলায় প্রায় দুশ বছরের উপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করেছেন। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়বস্তুর বস্তুভিত্তিক উপস্থাপনায় তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থটি তাই পূর্বসুরীদের রচনার তথ্যের ও বক্তব্যের নিছক সংক্ষিপ্তসারে পরিণত হয়নি। বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও উপস্থাপনার দিক থেকে গ্রন্থটি যেমন মৌলিকত্বের দাবি করতে পারে। তেমনি পুলিশ প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার

লেখকের গবেষণা- মনস্কতার পরিচয় বহন করে। গভীর অর্ন্তদৃষ্টি নিয়ে এ গ্রন্থ রচনায় লেখকের আন্তরিক প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয়। আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রন্থটিতে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও স্বায়ত্তশাসনমূলক বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে। অতএব বাঁকুড়া জেলায় আলোচ্য সময়ের ব্রিটিশ শাসনের সার্বিক পরিচয় এ গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে তা নয়। তাহলেও এ পুস্তিকাটিতে লেখক বাঁকুড়া জেলার যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা নিঃসন্দেহে পাঠকদের ঋদ্ধ করবে। তাছাড়া সন্নিবিষ্ট নূতন তথ্যসমূহ বাঁকুড়া গবেষকদেরও সহায়ক হবে। এদিক থেকে পুস্তিকাটি বাঁকুড়াচর্চা ভাণ্ডারে একটি মূল্যবান সংযোজন। পুস্তিকাটি সুলিখিত ও সুপাঠ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পুস্তিকাটি সুধী পাঠক মহলে নিজগুণে যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে।

অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
ইতিহাস
বাঁকুড়া খৃষ্টান মহাবিদ্যালয়

১২.০৫.২০০৮
নূতনচটি
বাঁকুড়া

অবতরণিকা

গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের রূপান্তরিত ভূমি ছোটনাগপুর মালভূমির পশ্চিমে প্রান্তিক অবস্থান বাঁকুড়ার। রাঢ় বাংলার বাকী অংশের ভূগোল, ইতিহাস, সংস্কৃতির সঙ্গে এই জঙ্গলমহল বাঁকুড়ার স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র ও অনন্যতা এখনও পূর্ণাঙ্গ প্রকাশের অপেক্ষায়। কৌম সভ্যতা বর্ণেতর শ্রমিক কৃষক মানুষের ইতিহাস ব্যাপ্ত ছিল বিস্তৃত সময়ের আধারে। আফগান, মোঘল, মারাঠা, ওড়িয়া, রাজসেনার পদশব্দে শান্ত তন্নিষ্ঠ জঙ্গল সভ্যতা সচকিত হলেও জঙ্গল দলপতিরা ছিলেন স্বাধীন সত্ত্বাধারী। 'বাঁকুড়া জনের' দারিদ্রের দীনতা থাকলেও মননের হীনতা ছিল না। দীর্ঘ রাজনৈতিক সুস্থিতির মধ্যে সমাজ ও জনজীবনের বাঁধন ও ভাষা আপন বৃত্তের মধ্যেই সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিল। সতেরো শতকে ব্রিটিশ বণিক শাসকদের আগ্রাসী আগমন কৌম্য সভ্যতার এতদিনকার বাঁধন তছনছ করে দেয়। বণিকের অর্থগৃধ্নতা, ও শাসকের দম্ভ ও বাণিজ্য ভাবনা এতদিনকার রাজনৈতিক বুনিয়াদ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে আমুল পরিবর্তিত করে। দুই শতাব্দী বিস্তৃত ব্রিটিশ শাসনকে আধারিত করা সুকঠিন কাজ। এই প্রবন্ধে সময়ের পারম্পর্যে শাসনধারা ও মাত্রিকতার লেখচিত্র মাত্র যা থেকে বৃহত্তর জীবনবৃত্ততে উপনীত হওয়া যায়, বিশ্লেষিত হয়ে, সংযুক্ত হয়ে।

সাবেকি স্বাতন্ত্র ও ভূমি নির্ভর সমাজ জীবনে ও কুটীর শিল্পের বিপর্যয় ঘটে। ঔপনিবেশিক মোড়কে নয়া আর্থ ব্যবস্থার আগমনে। ভূমিজ বিদ্রোহের আঁচ অস্তমিত হলে জঙ্গলমহলের মানুষের দিনলিপি ও ভাগ্যলিপি নিয়ন্ত্রিত হয় নয়া ব্যবস্থার অবিসংবাদিত আধিপত্যে। সাগরপারের শাসকের নয়া ক্ষমতার কেন্দ্র হল সমর শহর বাঁকুড়া। ফলশ্রুতি হিসাবে মল্ল রাজধানী মন্দির শহর বিষ্ণুপুরের রাজগরিমা অস্তমিত হয়। ইংরেজ বণিকদের আনুকুল্যে সমৃদ্ধ হতে থাকে বাণিজ্য নগরী সোনামুখী। এই তিনটি জনপদের বাইরে বৃহত্তর বাঁকুড়ায় নাগরিক স্বাচ্ছন্দের

সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা ছিল স্থবির। উনিশ শতকে স্বায়ত্তশাসনের আদিরূপ বিকাশিত হলেও তা ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থ নিয়ন্ত্রিত।

বিংশ শতাব্দীর দেশমুক্তির আবেগ ও আন্দোলন বাঁকুড়াকে আলোড়িত করে। আইনের শাসন, স্বরাজ, শ্রমিক-কৃষকদের ঔপনিবেশিক শোষণ জাল থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম সুতীব্র ছিল বাঁকুড়ায়।

দুই শতাব্দীর চলচ্ছবি ক্ষুদ্র ক্যানভাসে আঁকার প্রচেষ্টা আগামীতে সুধী পাঠকদের কিয়দংশে তৃপ্ত করলেও আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। এই পুস্তক প্রকাশিত হতে পেরেছে খেয়ালী পত্রিকাগোষ্ঠী, বিশেষত সম্পাদক গিরীন্দ্র শেখর চক্রবর্ত্তী ও পৌরসদস্য দেবাশীষ লাহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। ইতিহাসবিদ শ্রদ্ধেয় রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর বিভিন্ন রচনা ও মৌখিক পরামর্শ লেখককে এ ধরণের প্রবন্ধ রচনায় প্রাণিত করেছে। অধ্যাপক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক লীলাময় মুখোপাধ্যায়ের নিরন্তর উৎসাহদানে এই পুস্তক প্রকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। সৌমিত্রশঙ্কর সেনগুপ্ত, বাঁকুড়া সদর মহকুমা শাসক (প্রাক্তন) ও অজয় কুমার ঘোষ, বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসকের কাছে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে ঋণী থাকব। গৌতম দে (প্রবন্ধকার ও গল্পকার), বিশ্বজিৎ বরাট, এন আর ডি এম এস, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম রাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের বিভিন্ন তথ্য গ্রন্থ রচনায় সহায়ক হয়েছে। এছাড়া যাঁদের নাম অনুল্লিখিত থাকল, তাদের অবদান কম কিছু নয়। মুদ্রণের কাজে হাইটেক লেসার প্রিন্টার-এর দক্ষতা উল্লেখের দাবী রাখে। গ্রন্থ প্রকাশের প্রথম প্রয়াসে যে ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গেল, তা পাঠকবর্গ নিজগুণে মার্জনা করবেন।

সুদীপ্ত পোড়েল।

বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ শাসন ঃ ১৭৬০-১৯৪৭

বাঁকুড়া শহরের **পত্তন** ঃ বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ আগমন

সপ্তদশ শতকে মোগল সময়ে বর্তমান বাঁকুড়া জেলা ছিল সরকার-ই-মদারন 'প্রশাসনিক বিভাগে' অঙ্গীভূত। বিষ্ণুপুর, পাঁচেত, চন্দ্রকোনার মতো রাজশাসিত অঞ্চলগুলি এই বিভাগের অন্তর্ভূক্ত পৃথক রাজস্ব বিভাগ হিসাবে গণ্য হত। ১৭২২ খ্রীঃ নবাব জাফর খানের সময় প্রশাসনিক সুবিধা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে সুবা বাংলার ৩৩ টি 'প্রশাসনিক বিভাগের' পরিবর্তে ১৩টি বৃহত্তর চাকলা গঠিত হয়। বাঁকুড়া ছিল বর্ধমান চাকলার মধ্যে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় সুবা বাংলায় কার্যত ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত ঘটায়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর বাংলার নবাব মীরকাশিম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পরগনা বর্ধমান, চাকলা মেদিনীপুর, থানা চট্টগ্রাম প্রদান করে সনদ জারী করেন। এর ফলে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার একাংশে (পরগনা বর্ধমানের রাইপুর থানাঞ্চল ও চাকলা মেদিনীপুরের অম্বিকানগর ও ছাতনা) সর্ব প্রথম ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারীর একটি প্রতিবেদন (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর) থেকে দেখা যায় ভারত সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ইংরেজরা ২২ অক্টোবর, ১৭৬৪ খ্রীঃ বাংলা সুবার দেওয়ানী হস্তগত করে। বাদশাহী ফরমানের তারিখ হল, ১২ আগষ্ট ১৭৬৫। দিল্লীর কোষাগারে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা আদায় দেওয়ার বিনিময়ে ১৭৬৫ খ্রীঃ রবি ফসল থেকেই কর আদায়ের পূর্ণ অধিকার মেলে। এই ফরমানে সমগ্র বাঁকুড়া ইংরেজের পদানত হয়।

প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে শহর বাঁকুড়ার গোড়াপত্তন ও প্রতিষ্ঠা ঘটে ইংরেজ আনুকূল্যেই। এর আগে এই ভূখণ্ডের রাজনীতি ও সমাজজীবন ছিল মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরকেন্দ্রিক। প্রায় ৪৪৪৪ একরের ৩৪ মৌজার এই বাঁকুড়া শহরে

অষ্টাদশ শতকেই ইংরেজ বণিক ও নীলকরদের আস্তানা গড়ে ওঠে। কারণ ১৮০৭ সালে জেলাশহর হিসাবে ঘোষিত হলে তৎকালীন নীলকরদের কুঠি ও কার্যালয়ে কিছু প্রশাসনিক বিভাগ শুরু হয়। মল্লরাজ বীরমল্ল ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এক্তেশ্বর মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাঁকুড়া, বেলগড়িয়া ও এক্তেশ্বর মৌজা তিনটিকে দেবোত্তর ঘোষণা করেন। এই সময় মৌজা তিনটির অনাদায়ী খাজনা ছিল ৩৭২ টাকা ৮ আনা। ১৭৬৫ খ্রীঃ লেঃ ইনসাইন জন ফারগুসনের নেতৃত্বে বিদ্রোহী সীমান্ত রাজাদের দমন করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেনাদের শিবির ছিল এই বাঁকুড়া শহরেই। অনুরূপ ভাবে ১৭৮৯-৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাইপুর কেন্দ্রিক চুয়াড় বিদ্রোহ দমনের জন্য কালেক্টর ক্রিস্টোফার কিটিং-এর নেতৃত্বে বাঁকুড়া সেনা শিবির থেকে সেনাদল পাতাকোলা নদীঘাট হয়ে বাঁকুড়া-রাইপুর সড়ক বরাবর অগ্রসর হয়। ১৭৬০ সালে বাঁকুড়ায় প্রথম দেওয়ানি লাভের পর শিউভট্টদের মারাঠী আক্রমণ থেকে ইংরেজ স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখতে এই শহরে সেনা সন্নিবেশ হয়েছিল বলে মনে হয়। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ শে মে কালেক্টর উইলিয়াম ব্লান্টের উদ্যোগে বিষ্ণুপুর থেকে বাঁকুড়ায় শাসনকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। সামরিক গুরুত্বের নিরিখে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে শহর বাঁকুড়ার পরিচিতি ছিল সমর শহর বা ক্যান্টনমন্টে টাউন হিসাবে।

চুয়াড় বিদ্রোহ এবং এনসাইন জন ফারগুসনের সামরিক অভিযান ঃ বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ আধিপত্য

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান পরগনা ও মেদিনীপুর চাকলার দেওয়ানী লাভের পর ইংরেজরা রাজস্ব আদায়ার্থে বর্ধমান শহরে ও মেদিনীপুর শহরে রেসিডেন্ট অফিস তৈরী করেন। মেদিনীপুরে প্রথম রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন জন জনস্টোন (১৭৬০-৬২)। এই দুই রেসিডেন্সির অন্তর্ভূক্ত বাঁকুড়ায় বশীভূত ও পরাভূত জমিদারদের উপর কোম্পানী কর ধার্য করে। এই পর্বে ইংরেজ শাসকদের প্রাথমিক লক্ষ্য দাঁড়ায় জঙ্গল মহলের রাজন্যবর্গের আনুগত্য লাভ, কর আদায় ও বাণিজ্যের প্রসার। এই সময় থেকে নীলাম ডাকের মাধ্যমে বার্ষিক রাজস্ব আদায় শুরু হয়। বংশানুক্রমিক জমিদারদের স্থলে সর্বোচ্চ নীলাম দিয়ে অনেক স্থানে নব্যভূস্বামীরা প্রতিষ্ঠিত হয়। নীলামী রাজস্ব সংগ্রহে এই ভূস্বামীদের অত্যাচারে গ্রাম বাঁকুড়ার রায়তদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। দেশের এই অংশের সরকারী ডাক ২২২৯৫৮ টাকার স্থালে নিলামী রাজস্ব দাঁড়ায় ৭৬৫৭০০ টাকা। রায়ত শোষণের এই পর্ব চলে প্রায় একদশক। ১৭৬১-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান প্রশাসক হ্যারি ভেরেলস্ট রাজস্ব আদায়ে দক্ষতা দেখানোয় ১৭৬৫ খ্রীঃ বর্ধমানের সুপারভাইজর ও ১৭৬৬ খ্রীঃ মেদিনীপুরের

সুপারভাইজার নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য ১৭৬৭ খ্রীঃ ২৬ শে জানুয়ারী ক্লাইভের দেশত্যাগের পর তিনি গভর্ণর হয়েছিলেন। বর্ধমান কলকাতার থেকে সুগম হওয়ায় সরাসরি কলকাতা থেকে বর্ধমান রেসিডেন্টের কাজ পরিচালিত হত।

এতদঞ্চলের বহুপ্রাচীন রাজ বংশগুলি কোম্পানী আরোপিত রাজস্ব ব্যবস্থাকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট গ্রাহামের নির্দেশে বিদ্রোহী ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেন ফারগুসন সাহেব। ফারগুসনকে লেখা গ্রাহামের ৩০/০১/৬৭ পত্রাঙ্কে দেখা যায় যে "To the west ward of Midnapore, there is a very large track of country comprehended within the limits of the Province, but of which the Zamindars, taking advantage of their situation, support themselves in a kind of Independence; The continuance of this Independence and is also thought to obstruct commercial intercourse, which used heretofore to subsist between the Bengali Provinces and the districts Westward of the Hills. The party, which you are appointed to command of, is destined, therefore to proceed against these Zamindars, with a view to reduce them to a proper subjection to our Government on payment of just revenue, to enforce their obedience to the authority of the Resident of Midnapore, and to encourage, if possible, the merchants of western district to open again their wonted communication with these Provinces." ১৬-০২-১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফারগুসন সাহেবের পত্র থেকে জানা যায় যে মানভূম, সুপুর, ছাতনা ও বরাভূম অঞ্চলে কোম্পানীর সামরিক অভিযান সফল হয়েছে। ফাগুর্সনের ছাতনা অভিযান ছিল বিতর্ক বিঘ্নিত। তখন মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্টের অধীনস্থ পাঞ্চেতরাজ ফৌজদারের সাহায্যে ছাতনারাজের থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। বিষয়টি মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট (সুপারভাইজার) জন ভেরেলষ্ট বাংলার কালেক্টর জেনারেল ক্লড রাসেলকে জানিয়ে লেখেন "We may perhaps be obliged to battle it with Mr. Sykes concerning one of our parganas. The Pancheat Raja, as he says, by orders from Murshidabad, summoned the Zamindars of Chhatna to repair to him and

settle his rents, and has threatened him with force in case of refusal. I have written the Raja that Chhatna belongs to this Province (Orissa) and that the rents are already settled and if he presumes to send any of his people into the parg. I shall certainly punish them." ভেরেলষ্ট মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট সাইকসকেও জানান যেহেতু ছাতনা সুবা ওড়িশার মেদিনীপুর চাকলায় অবস্থিত, রাজস্ব তাঁদেরই আদায় করার কথা। তিনি সাইকসকে নবাব সুজাউদ্দিনের সময়কার কাগজপত্র পরীক্ষা করার অনুরোধ জানান। উত্তরে সাইকস জানান যেহেতু মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ রেসিডেন্ট একই ব্রিটিশ প্রশাসনের, সেজন্য কাগজপত্র পরীক্ষা করার দরকার নেই। এরপর ছাতনা থেকে পাঁঞ্চেতরাজের প্রতিনিধি তুলে নেওয়া হয় এবং ছাতনায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব মেদিনীপুর রেসিডেন্টের হাতে বর্তায়। জনৈক লক্ষীনারায়ন মেদিনীপুর রেসিডেন্টের হয়ে বার্ষিক ২১৪৪ সিকা টাকার বিনিময়ে ছাতনার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নেন। ১৭৬৭ সালের মার্চে রেসিডেন্ট গ্রাহামকে লেখা লেঃ ফারগুসনের এক পত্র থেকে সামরিক অভিযানের অবস্থা জানা যায়, "If you consider the circumstance of my finding, every individual of them with all their people & efforts in the Jungle, I am hopefull it will reconcile any conduct to you, where you regard the time & manner and settlement itself for had I pursued them, it would probably have answered the end. To have pursued each separately would have been a work of time and to have divided my force, would have rendered my force success doubtful, as none of these Zamindars by our intelligence have 2000 people in their parganas whose trade is war." সুপারভাইজার ভেরেলস্ট গ্রাহামকে নির্দেশ দেন চাকলার সব জমিদারের আনুগত্য নিশ্চিত করতে। বিদ্রোহীদের আটকাতে সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দুর্গছাড়া প্রয়োজনে অন্যান্য সব দুর্গ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ জারী করা হয়। অভিযান চলার সময়েই জমিদারি এলাকা ঘুরে রাজস্ব নির্ধারণ করে ফেলতে বলা হয়। ফাগুর্সনের অভিযানে বিদ্রোহী জমিদারদের কঠোর ভাবে দমন করা হয়।

১৭৬৫ খ্রীঃ অক্টোবরে জন গ্রাহাম মেদিনীপুর চাকলার রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। এক সন্তানের জনক (৩ বছর আগে মেরী শুইনের পাণি গ্রহণ করেন) এই গ্রাহাম

ছিলেন মানুষ হিসাবে অত্যন্ত অসৎ। বর্ধমান রাজ পরিবার-কেলেঙ্কারির নায়ক গ্রাহাম বর্ধমান রাজের কাছে ১ লক্ষ টাকা ঘুষ নেন এবং রানীর নাবালক সন্তানের ১১ লক্ষ টাকা তছরুপ করেন। লর্ড ক্লাইভ তাঁর এই অসততায় বিরক্ত ছিলেন।

লেঃ জন এনসাইন ফারগুসনের এই জঙ্গল মহল অভিযান এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই অভিযানের সাফল্য জঙ্গলমহলের এতদিনকার ভূমিব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে আমূল বদলে দেয়। জমিদারের পরিবর্তে কোম্পানী অনুগত দেওয়ান-সাজোয়াল, ঘাটোয়ালের বদলে দারোগা, পাইকদের বদলে পুলিশ ও ডাকহরকরার যুগের সূচনা ঘটে। গ্রাহামের পরিকল্পনা মতো এই দীর্ঘ ও কষ্টকর অভিযানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন মেদিনীপুর-ধারিন্দার পাইক কর্মচারী কার্ত্তিক রাম (এলাকা সম্পর্কে অভিজ্ঞ), চন্দন ঘোষ (রাজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ)। আর ছিলেন তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী।

ধারওয়ার শিবিরে অবস্থান কালে তিনি ঝাড়গ্রাম, কল্যাণপুর ও ফুলকুসমার জমিদারদের ডেকে পাঠান। ইতিমধ্যেই কর্ণগড় ও ঝাড়গ্রামে ব্রিটিশ আধিপত্য স্বীকৃত হয়েছিল। ফুলকুসমা জমিদারের বার্ষিক রাজস্ব নির্ধারিত হয় ৫০০ টাকা। কিন্তু জমিদার সুন্দরনারায়ণ ৩০০ টাকা দিতে সম্মত হয়। গ্রাহাম এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। কারণ তাঁর সন্দেহ ছিল মেদিনীপুরের ইংরেজ ও দেশীয় লবন বণিক অধ্যুষিত সমৃদ্ধ গ্রাম আনন্দপুর লুণ্ঠনে ফুলকুসমা জমিদারের হাত আছে।

রাইপুরের দুর্জন সিংহ ছিলেন ২৭ মৌজার মোকাবরী স্বত্ত্বধারী ৫২ পুরুষের জমিদারির মালিক। তাঁর রাজস্ব নির্ধারিত হয় ২৫০০ টাকা, কিন্তু তা তিনি দিতে অস্বীকার করেন। তবে বলরামপুর সেনা ছাউনিতে অবস্থানকালে রাইপুর, ফুলকুসমার জমিদার ফাগুর্সনের সাথে এই বিষয়ে আলোচনায় বসার মিথ্যে আশ্বাস দেন। তবে গ্রাহাম এদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে ফারগুসনকে আগেই সতর্ক করেছিলেন। ফারগুসন ছাতনা অভিযান শেষে রাইপুর যান। শিবির করেন সুপুরে। ইতিমধ্যে রাইপুরের সিমলাপাল, সুপুর, ছাতনা, অম্বিকানগর কোম্পানীর রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়। তবে ফারগুসনের ফুলকুসমা-রাইপুরের রাজস্ব নির্ধারণ কালে, এক্তিয়ারের প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেয়। রাইপুর ও ফুলকুসমার জমিদার দাবি করেন যে তাঁরা সুবা বাংলার বর্ধমান চাকলার অর্ন্তভূক্ত, ওড়িশাসুবার মেদিনীপুর চাকলার নয়। এইমর্মে তাঁরা ফারগুসনকে বর্ধমানের রাজস্ব আধিকারিক গুডউইন স্বাক্ষরিত একটি কাগজও দেখান। তাঁদের আর্জি মেনে এই পর্বে রাইপুর, ফুলকুসমা, সিমলাপালের জমিদারকে বগড়ীরাজের মাধ্যমে বর্ধমানে রাজস্ব জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় বলে অনুমিত। এই সময় বিষ্ণুপুর রাজ ছিল অর্ন্তকলহদীর্ণ। ফারগুসনের সামরিক

অভিযানের সময় বিষ্ণুপুর জমিদারির অন্যতম দাবিদার দামোদর সিংহ অম্বিকানগরে আশ্রয় নিয়ে নিজ শক্তি সুসংহত করার চেষ্টা করছিলেন। ফারগুসন তাঁকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করেন। সিমলাপালরাজ ফারগুসনকে লোকবল দিয়ে এবং ছাতনারাজ তাঁকে ১০০০ পাইক দিয়ে সাহায্য করেন। সুপুর পরগনার রাজস্ব নির্ধারিত হয় ৫৪ টাকা। ছাতনার ৮৭৯ টাকা ১১ আনা, অম্বিকানগরের ৩১১ টাকা। উল্লেখ্য অভিযানকালে রাইপুরের সমৃদ্ধ কৃষিক্ষেত দেখে ফাগুর্সন অবাক হয়েছিলেন। কোম্পানী নির্ধারিত রাজস্ব পরিশোধে জমিদারদের প্রজাপীড়ন ও লুণ্ঠনের আশ্রয় নিতে হয়। অম্বিকানগরের জমিদার রাজস্ব পরিশোধে লুণ্ঠনের আশ্রয় নেন।

দুর্জন সিংহের সাথে ভেলাইডিহার মোহনদাস চৌধুরী, ফুলকুসমার সুন্দরনারায়ণ, বগড়ীর রাজা ছত্র সিংহ এক বিদ্রেহী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলে। কর্ণগড়ের রানী শিরোমণি, ঘাটশীলার রাজা জগন্নাথ ধল্ল, মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ ইতিমধ্যে বিক্ষুদ্ধ। ১৭৬৬ খ্রীঃ মল্লরাজের রাজস্ব নির্ধারিত হয় ২২৫০০০ টাকা। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির এই কর নির্ধারণ ছিল পূর্বেকার দেয় করের বহুগুণ। যেখানে নবাবকে দেয় ১৭৪২ সালের রাজস্ব ছিল ১১১৮০৩ সিক্কা টাকা, কোম্পানী শাসনে ১৭৬২-৬৩ সনে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩৬০৪৫ সিক্কা টাকা এবং ১৭৮৯-৭০ খ্রীঃ ২৫০৫০১ টাকা, ১৭৭০-৭১ খ্রীঃ ২৮০৫০১ সিক্কা টাকা। ১৭৭২ সালের পাঁচশালা বন্দোবস্ত , ৯০ এর দশশালা বন্দোবস্ত, ৯৩ এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বনেদী জমিদার বংশ, জমিদারিত্ব ও পুরানো রাজস্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটায়। তৈরী হয় নব্য জমিদার শ্রেণী।

১৭৬০ সালে বাঁকুড়ায় ব্রিট্রিশ শাসনের সূচনা হলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষিত করার প্রয়াস নেয় ও দেশীয় রাজন্যবর্গকে আরোপিত রাজস্ব আদায় দিতে বাধ্য করে। ১৯৬৫ সনের বাদশাহী সনদে সুবা বাংলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব স্বীকৃত হলে এই প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়। প্রায় স্বাধীন দেশীয় ভূস্বামীরা এই রাজস্ব আদায় মেনে নিতে পারেননি। ১৭৭২ খ্রীঃ পাঁচশালা বন্দোবস্ত, ১৭৯০ খ্রীঃ দশশালা বন্দোবস্ত, ১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই সাবেকি জমিদারি ও রাজস্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক শাসকদের তাঁবেদার জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়। এই শ্রেণীই দেশমুক্তির সময়কাল পর্যন্ত ছিল ইংরেজ শাসনের স্তম্ভ। ১৭৬০ থেকে ১৭৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত রেসিডেন্ট সুপারভাইজর জনস্টোন, গ্রাহাম, আলেকজান্ডার হিগিনস, ডসন, এরনস্ট, জিঃ আর ফলি, পরবর্তীকালে বার্গেস, অসওয়াল্ড, ডেভিসের মতো ইংরেজ প্রশাসকদের ব্যস্ত থাকতে হয়েছে, জমিদার শ্রেণীর উপর ইংরেজ শাসনকে সুসংহত করে রাজস্ব আদায় এবং কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থকে সুরক্ষিত

করতে। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সোনামুখীতে ইংরেজ বাণিজ্যকুঠী স্থাপিত হয়। ইংরেজ বণিক চীপ দীর্ঘকাল এই বাণিজ্য কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন (Commercial Resident)। চীপের পর জে এরস্কিন এই কেন্দ্রের দায়িত্বে আসেন। কার্পাস, রেশম, লাক্ষা, নীলসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ে জড়িত ছিলেন ইংরেজ বণিকরা। সোনামুখী কুঠির অধীনস্থ শাখা কুঠী ছিল আসুরিয়া, দেসুরিয়া, নারায়নপুর, রামপুর, তামুলি, কৃষ্ণনগর, গোপালপুর, ধাড়িমপুর, হদল, পারুলিয়ায়। ডাঃ চীকের বাঁকুড়া কুঠীর অধীনস্ত কুঠী গুলি অবস্থিত ছিল অযোধ্যা, আমডাংড়া, চম্পাতলা, জয়পুর, কোতুলপুর, গোপালনগর, ঘাটনগর, বরা, জামুড়িয়া, ককিল্যা, পাত্রসায়েরে। তাছাড়া অপ্রধান কুঠীগুলি অবস্থিত ছিল সাঁতুড়ি, দীঘা, কুপায়, রোল, ওন্দা, চামটা, নিকুঞ্জপুর, সারেঙ্গা, দেউলি, ইন্দপুর (শালুকা), সুরুল, লোকপুরে।

লেঃ ফারগুসনের সামরিক অভিযানে বাঁকুড়ার বিস্তৃত অঞ্চলে কোম্পানী শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও বিদ্রোহ পুরোপুরি স্তব্ধ হয়নি। বিশেষত দুর্জন সিংহের নের্তৃত্বে বিদ্রোহ চলে প্রায় তিন দশক। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে আপাত অনুগত দুর্জন সিংহের রাইপুরকে নদীয়া রেসিডেন্টের অধীনে চালান করা হয়। পরে অবশ্য তা বর্ধমান রেসিডেন্টের অধীনে আসে। ১৭৬৭, ১৭৬৯, ১৭৭০ সালের সামরিক অভিযানেও এই অঞ্চলে বিদ্রোহীদের নির্মূল করা যায়নি। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ফারগুসনের দীর্ঘায়িত অভিযান শেষেও দুর্জন সিং রাজস্ব শোধে অপারগ হওয়ার সাজোয়ালের সম্মুখীন হন। জমিদারী ও রাজস্ব বিবাদের নিস্পত্তিতে বর্ধমান প্রশাসনের কাছে আবেদনের পাশাপাশি তিনি ভেলাইডিহার জমিদার মোহন চৌধুরী, ফুলকুসমার সুন্দর নারায়ন, বগড়ির ছত্র সিংহের সহায়তায় বিদ্রোহী বাহিনী গড়ে তোলেন। (উল্লেখ্য ঘাটশিলার জমিদার একই সময়ে বিদ্রোহী)। ক্যাপ্টেন ফোর্বস ও লেঃ নান বিদ্রোহীদের গোরিলা আক্রমণের সামনে সামরিক সাফল্য পেলেন না। ১৭৭৯ সনে বিদ্রোহী দুর্জনকে বর্ধমানে ডেকে পাঠিয়ে অন্তরীণ করা হয়। তাঁর অপরাধ ছিল ঘাটশীলার জমিদার জগন্নাথ ধল্লের সাথে পত্রালাপ করে সহায়তা প্রার্থনা। তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল কর্ণগড়ের বিদ্রোহী রানী শিরোমণি এই সময় নায়েব সীতারাম খানের মৃত্যুতে মূহ্যমান ছিলেন। যাই হোক দুর্জন সিংহ প্রমাণাভাবে জেল থেকে মুক্তি পান। এই সময় রাইপুরের দায়িত্বে ছিলেন বগড়ীর নুতন জমিদার জয়দেব সিংহ। ১৭৮৩ সালে তাকে (দুর্জন সিংহকে) আবার বিদ্রোহী নেতার ভূমিকায় দেখা যায়। এই সময়ে তাঁর রাজস্ব নিধারিত হয়েছিল ২৫০৯ টাকা। কিন্তু দুর্জন সিংহ আবারও কর পরিশোধে ব্যর্থ হন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে সেজোয়াল পাঠিয়ে বকেয়া আদায়ের

চেষ্টা হয়। ১৭৯৩র ১৯শে জুলাই, বকেয়া ৩১৪৫ টাকা অনাদায়ী রাজস্বের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হয়। এরপর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০আগষ্ট বর্ধমানের কালেক্টররেটে ২৫০৯ টাকা সরকারি রেটে রাইপুর জমিদারির নীলামের নোটিশ ঝোলানো হয় ও শিউপ্রসাদ ৭০২৫ টাকায় তা খরিদ করেন। জমিদারী বাঁচানোর চেষ্টায় দুর্জন সিং নিজ পুত্র ফতে সিংকে ম্যানেজার করে রাইপুরের বকেয়া রাজস্ব পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর্ধমানের কালেক্টর স্যামুয়েল ডেভিসের কাছে আবেদন করেন। কালেক্টর এই আর্জি নামঞ্জুর করলে, জেলা আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দুর্জন আপিল করেন ও জয়ী হন। কিন্তু কালেক্টর, কলকাতা সদর আদালতে, জেলা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে জয়ী হন। এরপর দুর্জন সিং তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল জমিদারদের একত্রিত করে বিদ্রোহকে চূড়ান্ত রূপ দেন।

কোম্পানীর ১৫/০৬/৭৩ তারিখের ১৪৯ নম্বর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দুর্জন সিংহ বিদ্রোহের রসদ যোগনোর জন্য কোম্পানী রাজস্ব লুণ্ঠন ও বড়হাজারী বালিয়াড়া, সহরজোড়া, ছাতনা, এলাকায় লুণ্ঠনরাজ চালান। কোনকোন ক্ষেত্রে কোম্পানীসেনাও লুণ্ঠনে যুক্ত ছিল। মেদিনীপুরের কালেক্টর স্যামুয়েল লুয়িসের জ্ঞাতসারেই রাইপুরের লুণ্ঠনে যুক্ত ছিল কোম্পানী পল্টন। লেঃ কার্টিয়ারের সেনাদল ঘাটশিলা অভিযানের সময় দুই পার্শ্বস্থ গ্রামে লুঠতরাজ চালান। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে কোলকাতায় আপীল মামলায় পরাজিত হয়ে দুর্জন পুত্র ফতে সিং ১৫০০ পাইক নিয়ে রাইপুর কাছারি দখল ও ভস্মীভূত করেন। শিউপ্রসাদের কর্মচারীদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। লেঃ হীলের নেতৃত্বে বিশাল সেনা ফতে সিং এর খোঁজে নয়াঘর সরাকল, কুইলাপাল থেকে ধান্দকা পর্যন্ত অনুসরণ করেন কিন্তু নিজেরাই চোয়াড়দের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। শিউপ্রসাদ পরপর কর্মচারী নিয়োগ করেও রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হলেন। আদায়কারীরা বিদ্রেহীদের হাতে নিহত হলেন। নুতন করে নীলাম হলে জনৈক হীরালাল রাইপুর জমিদারি ক্রয় করেন। কোম্পানী শাসনের এই পর্বে বেয়ারা পাইকদের উচ্ছেদ করে নুতন রায়ত স্থাপনের নীতি নেওয়া হয়। সদর আদালতে নীলামের বিরুদ্ধে দুর্জনের আপীল খারিজ হলে শুরু হয় বিদ্রোহের চূড়ান্ত পর্ব। একদিন একরাত্রির এই অভিযানে কাছারি বাড়ী বিধ্বস্ত হয়। ভয়ে কোম্পানী-জমিদার কর্মচারীরা মেদিনীপুরে পালিয়ে যায়। বিদ্রোহের ফলে কোম্পানীর অনেক সিপাই-বরকনদাজ প্রাণ হারান। ১৭৯৮ এর জুলাই-আগষ্ট মাসে নূতন জমিদার, কালেক্টর আর কানিংহামকে জমিদারি দখল দেবার আবেদন জানিয়ে যে সব পত্রাদি লেখেন তাতে বিদ্রোহের প্রকৃতি অনুমান করা যায়। ১৭৯৮ খ্রীঃ

মার্চে রায়পুরের ৩০টি গ্রামের উপর ১৫০০ বাহিনী নিয়ে দুর্জন আধিপত্য বিস্তার করেন। জমিদার অনুগত রায়ত ও কর্মীরা অনেকেই নিহত বা আহত হন। অনেকে এলাকা ছেড়ে চলে যান। প্রাণভয়ে জমিদারের নায়েব গোমস্তা, দারোগা রাইপুর থেকে মেদিনীপুর শহরে আশ্রয় নেন। এপ্রিলে ব্রিটিশ বাহিনী রাইপুরের পুনরায় দখল নেয়। মে মাসে দুর্জনের নেতৃত্বে ৫০০ চুয়াড় অতর্কিতে হানা দিয়ে জমিদার-নায়েবের কাছারি বাড়ি লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করেন। নিকটস্থ গুনারী থানা সেনাকেন্দ্র আক্রমণ করলে সরকারী সেনার সাথে তুমুল যুদ্ধে দুর্জন পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসারণ করেন। এই যুদ্ধ চলেছিল সন্ধ্যা থেকে পরদিন সকাল ১০ টা পর্যন্ত। জুলাই আগষ্ট মাসে দুর্জনের নেতৃত্বে একটি বড় বাহিনী সরকারী সেনাকে পরাজিত করে প্রধান বাজার ও কাছাড়ি বাড়ি ধ্বংস করে দেয়। তিনি একটি মাটির দুর্গ তৈরী করেন। রায়পুর থেকে কোম্পানী শাসন অবলুপ্ত হয়। জুলাই-আগষ্টে এই সংঘর্ষের সূচনা হয় সিপাহী ব্যারাকের কাছে চাষরত দুই কৃষক সকাল ৮ ঘটিকায় চুয়াড় হানায় নিহত হওয়ায়। এরপর কোম্পানী-জমিদার সেনার সাথে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ শুরু হয় ও বেলা ১২টায় তাঁরা পিছু হটে। দুইজন সিপাহী ও ছয়-সাত জন জমাদার-বরকন্দাজ গুরুতর ভাবে আহত হয়। ১৬ই শ্রাবন চুয়াড়-সিপাহী সংঘর্ষে জমাদার নিজে ও ৪ জন সিপাহী নিহত হয়, দারোগা দলের তিন জন, জমিদারের ছয়-সাত জন ও আরও অনেকে আহত হয়। বিদ্রোহ চলাকালেই অসুস্থতার অজুহাতে সেনাপতি হেনরি মেদিনীপুরে ফিরে যান। এরপর পল্টন সুবাদার আহ্লাদ সিংহ ছয় মাস রাইপুরে অবস্থান করলেও একজন বিদ্রোহীকেও ধরতে পারলেন না। বিদ্রোহে আন্দোলিত রাইপুরে কৃষিকাজ সাময়িক ভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। নায়েব কিনুবক্সী বলরামপুরে পালানোর সময় লালগড়ে দুর্জনের ভাইপোর হাতে নিহত হন। রায়তদের দলিলপত্র তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। কোম্পানীকে লেখা বর্ধমান কালেক্টর আর কানংহামের ৫/১১/১৮০০ ও ৫/১২/১৮০০ তারিখের পত্রাঙ্কে জানা যায়, কোম্পানী হীরালালকে ৬৮৫৭ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে কারারুদ্ধ ফতে সিংকে রায়পুরের জমিদারি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এর আগে ১৭৭৯ খ্রীঃ লুণ্ঠন ইত্যাদি অভিযোগ বর্ধমানে দুর্জনের বিচার শুরু হলেও সাক্ষীর অভাবে তিনি খালাস পান। ১৭৯৯ খ্রীঃ এ কালেক্টর প্রতিবেদনে দেখা যায় সুপুর-অম্বিকানগরে পুণর্বার এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। দারোগারা বিদ্রোহীদের গতিবিধি লক্ষ্য করা ছাড়া আর কোন প্রতিরোধ মূলক কাজে কার্যকরী ছিলেন না, এই অবস্থায় সিপাহী প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু উদীয়মান ব্রিটিশ শাসনে দুর্জন-ফতে এলাকার অবস্থা আরও খারাপ হয়।

সিংহরা হৃত সাম্রাজ্য গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেননি। বরং দুর্জন সিংহ ইংরেজের ১০ টাকার বেতনভূক রক্ষীতে পরিণত হয় (১৮০০ খ্রীঃ - ১৮২১ খ্রীঃ পর্যন্ত)।

নয়া উপনিবেশিক রাজস্ব ব্যবস্থা, ১৭৬০ খ্রীঃ বর্গী হাঙ্গামা, ১৭৭০ খ্রীঃ মন্বন্তর, ১৭৭৩ খ্রীঃ সন্ন্যাস বিদ্রোহ, ১৭৮৫ খ্রীঃ পাহাড়ী হাঙ্গামা ও ১৭৮৯ খ্রীঃ চুয়াড় বিদ্রোহ এবং মল্লরাজত্বের অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে শাসন তান্ত্রিক সংস্কার ঃ সুপারভাইজার-আমিল-কালেক্টর ঃ হিগিনসের এবং কিটিং-এর শাসন

মোটামুটি ভাবে বর্তমান বাঁকুড়ার কংসাবতীর দক্ষিনাংশ মেদিনীপুর চাকলার ও উত্তরাংশ বর্ধমান চাকলার অর্ন্তভূক্ত ছিল। এই দুই ভূখন্ডের ইতিহাসের ধারাও ছিল অনেকটা স্বতন্ত্র। দক্ষিণ ভূখণ্ডে যেমন ওড়িশা নরপতিদের প্রভাব ছিল লক্ষণীয় তেমনই উত্তরখণ্ডের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে গাঙ্গেয় নৃপতিদের দ্বারা। ১৭৬০ থেকে দক্ষিণখণ্ডে ইংরেজ আধিপত্যের সূচনাপর্ব ছিল বিদ্রোহ বিঘ্নিত আর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে উত্তরাঞ্চল ছিল স্থানীয় ভূস্বামী, বর্গী ও পাহাড়িয়া হানাদার কবলিত ও দুর্ভিক্ষ কলঙ্কিত। বলা যায় ঔপনিবেশিক উত্থানের মূলে ছিল ক্রমভঙ্গুর মোঘল শাসন, বিবাদক্লান্ত নবাবী শাসনের অস্থিরতা, বিভিন্ন দলপতির অধীনস্থ অসংহত মারাঠী সেনার চরম নিষ্ঠুরতা ও স্থানীয় ভূস্বামীদের ব্যর্থতা। ১৭৪২ সালের এপ্রিলে ভাস্কর পন্ডিতের নের্তৃত্বে বর্গী হাঙ্গামা প্রতিহত করতে, গিরিয়া যুদ্ধ বিজয়ী (ওড়িয়া নায়েব নাজিমের বিরুদ্ধে) নবাব আলীবর্দ্দীকে, বর্ধমান-কাটোয়া-বিষ্ণুপুর-মেদিনীপুর মুখী অভিযান করতে হয়। কিন্তু ক্রমাগত লুন্ঠন ও ধ্বংসলীলায় বর্গীরা বাংলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে ধ্বংসমুখে দাঁড় করায়। অবশেষে ১৭৫০ খ্রীঃ নবাব-বর্গী সন্ধি স্থাপিত হয়।

পুনরায় ১৭৬০ খ্রীঃ মার্চমাসে মারাঠা দলপতি শিউভট্ট মেদিনীপুরে খুসল সিংহকে পরাজিত করে ক্ষীরপাই হয়ে বিষ্ণুপুরে হাজির হন। অন্যদিকে সম্রাট শাহ আলম বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন ও মুর্শিদাবাদ অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সম্রাটকে প্রতিহত করতে ক্যাপ্টেন স্পিয়ার ও মীরকাশিমের নেতৃত্বে বাদশাহী সেনা কাটোয়ায় অপেক্ষা করতে থাকে ও পরে বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হয়। কলকাতা থেকে ফিসারের নেতৃত্বে ২০০ গোরা সেনা ও ৩০০ সেপাইয়ের সেনাদল নবাবকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়, যাদের মুর্শিদাবাদের সুরক্ষায় নিয়োজিত করা হয়। এদিকে বাদশাহ সেনাকে অনুসরণ করছিল মেজর ক্যালউড ও মিরনের নেতৃত্বে

সেনাদল। ০৪/০৪/১৭৬০ এ তারা স্পীয়ারের সেনাদলের সাথে মঙ্গলকোটে মিলিত হন। ৬ই এপ্রিল'৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই মিলিত সেনা দল বীরপুরে পৌঁছে জানতে পারে নিজ সেনানিবাসে অগ্নিসংযোগ করে বাদশাহী সেনা বিষ্ণুপুরের দিকে মারাঠা সেনার সাথে যোগ দিয়েছে এবং ১০ই এপ্রিল বিষ্ণুপুরে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল রেখে তাঁরা দামোদর নদ পার হয়ে পাটনা অভিমুখে পশ্চাৎ অপসারণ করেছেন।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ই এপ্রিল নবাব -ইংরেজ যৌথ সেনাদল বিষ্ণুপুর থেকে মোঘল-মারাঠা বাহিনীকে বিতাড়িত করে। এই সময় বিষ্ণুপুরের শাসক ছিলেন চৈতন্য সিংহ। চৈতন্য সিংহ ছিলেন একজন অপদার্থ শাসক (a man of weak intellect)। মন্ত্রী কমল বিশ্বাসই ছিলেন সর্বেসর্বা। রাজা ছিলেন ধর্মীয় আচার ও দেবআরাধনায় ব্যাপ্ত ও অন্ধ। দুর্নীতি সমগ্র প্রশাসনকে গ্রাস করে। পেশকার দর্পনারায়ন কর, জমিদার প্রতিনিধি চন্ডী মুখার্জী ও অন্যান্য রাজকর্মী সরকারী অর্থ আত্মসাতে লিপ্ত হন। মল্লভুমের আর্থিক প্রশাসন মুখ থুবড়ে পড়ে। এর পাশাপাশি রাজপরিবারের অর্ন্তবিরোধ মল্লভূম প্রশাসনের জীবনীশক্তি শেষ করে দেয়। পরিবারের বিদ্রোহী দামোদর সিংহ সিরাজদৌল্লার সহায়তায় মল্লরাজের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। কিন্তু দামোদর তীরবর্তী সিংহগোলার যুদ্ধে মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের কাছে পরাস্ত হন। এর কিছু সময় পর ১৭৬১ খ্রী দামোদর সিংহ নবাব মির্জাফরের সহায়তায় আবার অতর্কিতে আক্রমণ করে বিষ্ণুপুর দখল করেন এবং ১৭৬৪ সাল পর্যন্ত মল্লভূম শাসন করেন।

১৭৬৫ খ্রীঃ বাদশাহী ফরমানে মল্লভূমে কোম্পানী আধিপত্য স্বীকৃত হলে মল্লরাজের পাঁচশতাধিক কালের স্বাধীন সত্তা অন্তর্হিত হয়। ১৭৬৬ সালে মল্লভূম ব্রিটিশের খাস দখলে চলে যায়। তাঁর প্রশাসনিক ব্যয় নির্ধারিত হয় ৫৫১৪ টাকা ৯আনা ৮পাই ও খাজনা নির্ধারিত হয় ১৬১০৪৪ টাকা। যেখানে মল্লরাজ বাদশাহী খাজনাই পরিশোধ ব্যর্থ ছিলেন সেখানে ইংরেজ নির্ধারিত ক্রমবর্ধমান রাজস্ব মল্লরাজের পতন তরান্বিত করে। ১৭৬৯-৭০ খ্রীঃ রাজস্ব ছিল ২৫০৫০১ টাকা, ১৭৭০-৭১ খ্রীঃ ২৮০৫০১ টাকা, ১৭৭০-৭১ খ্রীঃ ২৮০৫০১ টাকা। ১৭৬৯-৭০ আদায়ী রাজস্ব ছিল ২৪০৮৫১ টাকা। মল্লভূমে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নৈরাজ্য, অধীনস্ত রাজস্ব আদায়কারীদের জুলুম ও রায়তদের রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থতা, কোম্পানির রাজস্ব নির্ণয়ে অপরিনামদর্শিতা কৃষি ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনে। কৃষকেরা পার্শ্ববর্তী জেলার অভিবাসিত হন। অকর্ষিত জমি হয়ে ওঠে জঙ্গলাকীর্ণ। হলওয়েল ও

হরচন্দ্র ঘোষের লেখনিতে ধরা পড়ে কিভাবে একটি ক্রমভঙ্গুর রাষ্ট্র কাঠামো কল্যানরাষ্ট্র থেকে দস্যু রাষ্ট্রে পরিনত হল। রাজস্ব সংগ্রহার্থে রাজ্যের ধনীব্যক্তিদের গৃহলুণ্ঠনের আশ্রয় নেয় রাষ্ট্র। প্রজারা লুণ্ঠনের ভীতিতে সাধারন ঘরে অনাড়ম্বর জীবন যাপন শুরু করে। ঘাটোয়ালদের ভূমিকা পথ নিরাপত্তা থেকে দস্যুতায় পর্যবসিত হয়। প্রজাদের উপর গৃহকর আরোপিত হয়।

এরূপ বিবিধ অভিঘাতে বিপর্যস্ত মল্লভূম তথা বাঁকুড়া ভূখণ্ডে নেমে আসে ১৭৭০ এর দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া। হান্টার 'এ্যানালসে' যথার্থই বলেছিলেন, "In the cold weather of 1769 Bengal was visited by a famine whose ravages two generations failed to repair" দুর্ভিক্ষের পটভূমি ব্যাখ্যায় তিনি বলেন "In the early part of 1769 high prices had ruled, owning to the partial failure of the crops in 1768, but the scarcity had not been so severe as materially to affect the govt. rental. But the periodical rains prematuarely ceased, and the crop, which depended on them for existence withered. 'The fieldrice' wrote the native superintendant of Bishenpore at a later period, "are become like fields of dried straw."

১৭৭০ খ্রীঃ মন্বন্তরে জাতি ও কৃষি ধ্বংশাপ্রাপ্ত হতে থাকলেও ঔপনেবেশিক শাসকদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। যদিও এই দুর্ভিক্ষে জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ও কৃষি সমাজের অর্ধাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অথচ ১৭৭০ খ্রীঃ নবাবী রাজস্ব মন্ত্রী রেজা খাঁ রাজস্বহার ১০% বৃদ্ধি করেন। ২৩ নভেম্বর ১৭৬৮ খ্রীঃ এ গভর্নর ভেরেলেষ্টের পত্র থেকে রাজস্ব অনাদায়ের উদ্বেগ থাকলেও দুর্ভিক্ষের ঈঙ্গিত ছিল না। হান্টারের 'এ্যানালসে' দেখা যায় যে "On 24th of December, after the last harvest of the year have been gathered in, Mr. Gerelst laid down his office, without having conveyed to his masters a single intimation of the true nature of the impending famine" এই ভয়াবহ মন্বন্তরেও তারা করভার লাঘব করেননি বরং বাড়ানো হয়েছে। "On the same day Mr. Cartier took over charge of the province, but he seems to have intimated to his masters no further anxiety until late in January 1770. In the fourth week of the month he writes that one district was suffering so severely that some

slight remission of the land tax would have to be made; but ten days afterward he informs the court, that although the distr was undoubtedly very great, the council had not "yet found any failure in the revenue or stated payment" ইংরাজ মনোনীত নায়েব – দেওয়ান রেঁজা খাঁর অত্যাচারে ও মন্বন্তরে বাংলায় স্মশানের স্বব্ধতা নেমে আসে। অবশেষে ব্রিটিশ শাসকদের এই অবস্থার উপলব্ধি জন্মে। হান্টারের ভাষায় "The marvelous and infinitely pathetic silence under suffering which characterizes the Bengalee at length was broken; and in the second week of May, the Central Government awoke to find itself in the midst of universal and irremediable starvation." The mortality, the beggary, they then wrote, exceed all description. Above one third of the inhabitants have perished in the once plentiful province of Purneah, and in other parts the misery is equal" এই সময় বিষ্ণুপুর অঞ্চলে দেশীয় আদায়কারী ছিলেন গোলাম মুস্তাফা।

১৭৭০ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ ও বিদ্রোহ জনিত শস্য ও সামাজিক বিপর্যয় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে প্রশাসনিক সংস্কারে ভাবিত করে। ১৭৭০ সালেই কোম্পানী দেশীয় আদায়কারী দেওয়ান আমিলের পরিবর্তে ইংরেজ সুপারভাইজার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। বিষ্ণুপুর, বীরভূম, পাঞ্চেতের জন্য আলেকজান্ডার হিগিনস সুপারভাইজার নিযুক্ত হন। এই সুপারভাইজারদের মূল ভূমিকাই ছিল চালু হস্তাবুদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরী ও সম্ভাব্য ও সঠিক রাজস্বহার নির্ণয়। সুপারভাইজর ও আমিলদের সংঘাত এড়াতে ১৭৭০ খ্রীঃ অক্টোবরে আমিল পদের বিলোপ ঘটানো হয়। এই সময় হিগিনস মুর্শিদাবাদ রেসিডেন্টের অধীনস্থ ছিলেন। রাজস্ব নির্ধারণ জোরালো করতে গভর্নর হেস্টিংসের সভাপতিত্বে 'সারকিট কমিটি' গঠন করা হয়, ১৭৭২ খ্রীঃ জুনে যারা জেলায় জেলায় সমীক্ষা করে পরবর্তী পাঁচ বছরের রাজস্ব নির্ধারণ শুরু করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীঃ ১১ মে রাজস্বমন্ত্রী রেজা খাঁকে অপসৃত করে গভর্নর কাউন্সিলকে রাজস্ব কমিটিতে রূপান্তরিত করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে একে বোর্ড অফ রেভিনিউতে রূপান্তরিত করা হয়। এই সময় সুপারভাইজারদের কালেক্টর হিসাবে অভিহিত করা হত। কিন্তু ১৭৭৩ খ্রীঃ কালেক্টরদের প্রত্যাহার করে পুনরায় দেশীয় আমিলদের নিয়োগ করা হয়। এদের তত্ত্বাবধান করতেন কয়েকটি

জেলা নিয়ে গঠিত প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল, যার শীর্ষে ছিলেন একজন চীফ। তাছাড়া ৪ জন বরিষ্ঠ আধিকারিক, একজন পার্সী অনুবাদক, হিসাবরক্ষক ও সহায়ক ছিলেন তাঁর সাহায্যকারী। ১৭৭৩ খ্রী ১৯শে জানুয়ারী বীরভূম এবং পাঞ্চেৎ – বিষ্ণুপুরের জন্য স্বতন্ত্র কালেক্টর নিয়োগ হলেও ২৮মে ১৭৭৩ খ্রীঃ এই পদের বিলোপ ঘটে ও সরাসরি কলিকাতায় রাজস্ব জমার ব্যবস্থা হয়। এই সময় বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, পাঞ্চেৎ – বীরভূম, পাঞ্চেৎ -রামগড়কে নিয়ে গঠিত বর্ধমান প্রশাসনিক বিভাগের প্রধান ছিলেন ক্যাপ্টেন কারনাক। পরবর্তী কমিশনার / রেসিডেন্ট ডসন ১৭৬৬ খ্রীঃ বিষ্ণুপুররাজের বাজেয়াপ্ত নিষ্কর জমি ফিরিয়ে দেন। বার্ষিক ২২৫০০০ টাকা রাজস্ব জমা দেবার শর্তে চৈতন্য সিংহ জমিদারি ফিরে পান। এই বিবিধ রাজনৈতিক পরিবর্তনেও রাজস্ব আদায় ছিল অসন্তোষজনক। গভর্নর জেনারেলকে 'কোর্ট অব ডিরেক্টর' ১৭৮৫ খ্রীঃ ২১শে সেপ্টেম্বর জানায় "Frequent innovation were attended with much inconvenience and avoidable expense and that it was time to adopt a settled plan" লর্ড কর্ণওয়ালিশ ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৭৮৭ খ্রীঃ বোর্ড অব রেভেনিউকে জানান "revenue matters be settled in a way which would be of mutual advantage to the Government as also to the inhabitants of the land" জমিদারি বিভাজন এড়িয়ে আট লক্ষ টাকা রাজস্বের কম ভূমিবিশিষ্ট কালেক্টরশিপ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। বোর্ড অব রেভেনিউ প্রধান জন শোরের নির্দেশানুসারে ব্যায়সংকোচনার্থে ১৭৮৭ খ্রীঃ ১৩ মার্চ কালেক্টরশিপের সংখ্যা কমান হয়।

হস্তাবুদ থেকে দেখা যায় ১৭৭১-৭২ সালে হিগিনসের সময় বিষ্ণুপুররাজের রাজস্ব (জমা) ছিল ৪৭৯৬৬৬ টাকা ১৫ আনা ১৬ গন্ডা। পাঁচ বছর পরে যা হয় ৫১৮৭৩১ টাকা ১৩ আনা ১৫ গন্ডা। মল্লরাজের এই রাজস্ববিপর্যয়ের কালে আর এক বড় ঘটনা ১৭৭২-৭৩ খ্রীঃ সন্ন্যাস আগমন। কোর্ট অব ডাইরেক্টরতে লেখা কোম্পানী কাউন্সিল প্রেসিডেন্টের ১৫ই জানুয়ারী ১৭৭৩ খ্রীঃ পত্রাঙ্কে সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে জানা যায়, "A set of banditti knew under the name of Sanyasis or Fakirs, have long infested these countries; and, under pretence of religious piligrimage, have been accustomed to traverse the chief part of Bengal, begging, stealing, and plundering wherever they go, and as it best suits their convenience to practice." মন্বন্তর পরবর্তী বর্ষে জমি উচ্ছিন্ন কৃষকদল, যাদের হতে

চাষ করার কোন বীজ বা রসদ ছিল না তারা এই দলে যোগ দেন। প্রদেশ(উত্তর), বিহার, উঃবঙ্গের থেকে ফকির ও সন্ন্যাসীর দলের অনেকে বিষ্ণুপুর-মেদিনীপুর–পুরীগামী তীর্থসড়কে যাত্রাকালে পার্শ্বস্থ অঞ্চলে লুণ্ঠনের আশ্রয় নিত। বর্ষার শেষে দলে দলে এদের আগমন ঘটত। যদিও বেশীরভাগই ছিল ভেঙে যাওয়া নবাবী সেনা, তবুও জীবিকা উচ্ছিন্ন কারিগর ও কৃষকদের সন্ন্যাস বিদ্রোহে যোগদান তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ক্ষীরপাইয়ের কোম্পানী কুঠি, বিষ্ণুপুর-ছাতনার জমিদারি সন্ন্যাসদল কতৃক লুণ্ঠিত হয়। স্থানীয় মানুষই ইংরেজ ও তার তাঁবেদার জমিদারদের কোষাগার এদের চিনিয়ে দেয়। বলরামপুরের ফার্গুসনের শিবির আক্রমনের উদ্দ্যেশ্যে ৩০০০ সন্ন্যাসী সমবেত হয়েছিল বলে জানা যায়। মেদিনীপুর রেসিডেন্টকে লেখা বোর্ড অব রেভেনিউ প্রধান চার্লস স্টুয়ার্টের চিঠি থেকে (১৭৭৩ খ্রীঃ ১৭ মার্চের পত্রাঙ্কে) জানা যায় ক্যাপ্টেন ফোর্বস ৩০০০ সন্ন্যাসী দলকে তাড়া করে বিষ্ণুপুর-রায়পুর-ফুলকুসমা-শিলদা-আলমপুর ছড়িয়ে গোপীবল্লভপুরের দিকে নিয়ে যায়। গোপীবল্লভপুর ছিল মারাঠা নিয়ন্ত্রিত। এ সময় সন্ন্যাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেক সেপাইয়ের বিরুদ্ধে কোর্টমার্শাল শুরু হয়। তবে সন্ন্যাসবিদ্রোহ দমনে কোম্পানী ভাল বেগ পায়। ১৫ই জানুয়ারী ১৭৭৩ সনে কোম্পানী কাউন্সিলের কোর্ট অব ডাইরেক্টরকে লেখা পত্রাঙ্কে জানা যায় যে, "sepoys wcre at length totally defeated, and captain thomas (their leader) with almost the whole party, cut off." হেস্টিংস ৩১ মার্চ, ১৭৭৩ খ্রীঃ -এ স্বীকার করেন থমাসের পরবর্তী সেনাধ্যক্ষও বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন।

কোম্পানী অভিষ্ট প্রশাসনিক সংস্কারে কালেক্টরশিপ প্রচলন হলে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমকে মুর্শিদাবাদ কালেক্টরের অধীনে আনা হয় ১৮৮৪ খ্রীঃ সময়কালে। এসময় বিষ্ণুপুর-বীরভূম তথা মুর্শিদাবাদের কালেক্টর ছিলেন এডোয়ার্ড অটো। এইসময় সমস্ত এলাকা পাহাড়ী লুঠেরাদের হাতে চলে গিয়েছিল। ঠিক বর্ষার পরেই দলে দলে রাজমহল পাহাড় সহ বিহারি পার্বত্য এলাকা থেকে পাহাড়ী লুঠেরার দল নেমে আসত। এদের আটকানোর ক্ষমতা বীরভূম বা বিষ্ণুপুরের রাজার ছিল না। ১৫ই আগষ্ট ১৭৮৪ খ্রীঃ এডোয়ার্ড অটো গভর্ণর জেনারেলকে জানান, "In neither district was the hereditinry chief in a position to provide for the security of his people. Bodies of marauders congregated upon the frontier, where the mountain system slopes down upon the Gangetic valley, and in 1784 the civil had grown so

serious as to require the interference of the British power" এই লুটেরাদের দৌরাত্ম প্রশাসনের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেলে তিনি ২৬মার্চ ১৭৮৪ খ্রীঃ গভর্ণর জেনারেলকে জানান, "Civil authorities destitude of any force capable of making head against such an armed multitude" এবং চার শতাধিক লুঠেরাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সেনা চেয়ে পাঠান। ২৬মে ১৭৮৫ খ্রীঃ কালেক্টর কলকাতায় বার্তা পাঠান যে লুঠেরার সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি এবং সমতল আক্রমণের জন্য সংঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই দেশীয় রাজাদের দুর্বলতার কারণে এই দস্যুদল বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি গেড়েছিল ও সরকারী রাজস্ব লুণ্ঠনে অংশ নিয়েছিল। এর ফলে কোম্পানীর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। প্রজাদের ধূমায়িত ক্ষোভ প্রশমনে ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ থেকে এক আধিকারিক, প্রজাদের দুর্দশা অনুসন্ধানে ও ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব নির্ধারণে প্রেরিত হয়।

এই সময় জেলা কালেক্টর রাজস্ব সংগ্রহ, সাধারণ বিচার ও নিরাপত্তারক্ষা ছাড়াও প্রয়োজনীয় সামরিক অভিযানের মুখ্য নেতৃত্বে থাকতেন। রাজস্ব বোর্ডকে লেখা কিটিংসের ২২/১১/১৭৮৮ পত্রাঙ্কে দেখা যায় পাহাড়ী আক্রমণ থেকে বীরভূম সুরক্ষার জন্য কোম্পানী যথেষ্ট সেনা প্রেরণ করেছে। পাহাড়ীয়াদের অবাধ বিচারণ ক্ষেত্র বীরভূম-বিষ্ণুপুরকে দস্যুমুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন তিনি। পাহাড়ী আগমনের বিভিন্ন সড়কমুখ বা ঘাটে সেনা মোতায়েন করা হয়।

১৭৮৯ খ্রীঃ জুন মাসে ব্রিটিশ বাণিজ্য শহর ইলমবাজার ও সাকারোকোডা, পাহাড়ীয়াদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় এবং লুটেরাদল সদর শহর ও কালেক্টরের বাড়ির দুই ক্রোশের মধ্যে হাজির হয় (সূত্র ঃ রাজস্ব বোর্ডের কাছে প্রেরিত কালেক্টরের ১জুন ১৭৯২ পত্রাঙ্ক)। বীরভূমের পুরান রাজধানী শহর রাজনগর ৫ই জুন ১৭৮৯ খ্রীঃ লুণ্ঠিত হয়। ২৫ শে নভেম্বর জেলা শহরের কমান্ডিং অফিসার জানান সদর কার্যালয় পাহারা দিতে মাত্র ৪ জন রক্ষী তার কাছে অবশিষ্ট আছে। তিনি আরও জানান রাজস্বপার্টিকে রক্ষী দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় বিষ্ণুপুর থেকে বীরভূমে সেনা অপসারণ ছাড়া কিটিং-এর সামনে আর কোন বিকল্প ছিল না।

একই সময়ে পাহাড়ীদের হাতে পূর্বতন জেলা শহর বিষ্ণুপুরের পতন ঘটে। এ সময় মল্লরাজ চৈতন্য সিং বকেয়া খাজনার দায়ে কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে ইংরেজ সেনা বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করে। কিন্তু ১৭৯০ খ্রীঃ শুরুতে বিপুল সংখ্যক পাহাড়ী শহরের দখল নেয়। বীরভূম সুরক্ষার স্বার্থে রাতের অন্ধকারে কিটিং বিষ্ণুপুর থেকে সেনা অপসারণ করেন। কয়েকমাস মল্লশহর পাহাড়ীয়াদের

দখলে থাকলেও ১৭৯০ খ্রীঃ বর্ষা থেকে বিদ্রোহীদের মধ্যে অন্তর্কলহ শুরু হয় ও স্থানীয় বিক্ষুব্ধ মানুষ এদেরকে বিতাড়িত করতে ইংরেজদের সহযোগী হয়। কোম্পানী এই সুযোগে বিষ্ণুপুর পুনর্দখল করে এবং কঠোরভাবে বিদ্রোহীদের দমন করে। নিহত বিদ্রোহীদের ছিন্ন মস্তক সদরে পাঠান হয়। পাহাড়ী দস্যুদের লুণ্ঠনে ১৭৮২ খ্রীঃ আক্রান্ত জেলার ২ মাসে গড় রাজস্ব ও সম্পত্তির ক্ষতি ছিল ৬৬৬৬৬:১০:১০ সিক্কা টাকা বা £৭০০০০। এর থেকে ২ বৎসরাধিক লুণ্ঠনের মোট ক্ষতি অনুমান করা যায়।

এই বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে জেলা কালেক্টরদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার অভাব লক্ষিত হয়েছিল। ৯ই এপ্রিল ১৭৮৯ খ্রীঃ বর্ধমান কালেক্টর লরেন্স স্পেনসারকে কিটিং-এর লেখা পত্র থেকে জানা যায় পাহাড়ী দস্যুদের ধরতে ধাবমান বীরভূমের সেনাদলকে পাঞ্চেৎ সেনাদল বাধা দেয় এবং ৪-৫ জন দুবৃত্ত তাঁদের দিকে আশ্রয় পায় বলেও অভিযোগ।

১৭৭১ খ্রীঃ হিগিনস যখন বিষ্ণুপুর বীরভূমের সুপারভাইজর-কালেক্টর তখন এই অংশ ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষ কবলিত ও নিরন্নজন সমর্থিত বিদ্রোহী কবলিত। ১৭৭০ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষে ভয়াবহতা বোঝা যায় ডব্লু হান্টারের একটি বিবরণে "Although the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husbandmen sold their cattle; they sold their implements of agriculture; they devoured their seedgrain; they sold their son & daughters, till at length no longer of children could be found; they eat leaves of trees and the grass of field; and in June 1770 the resident at the Darbar affirmed that the living were feeding on the dead. Day & night a torrent of famished & diseases striken wretches poured into the great cities. The streets were blocked up with promiscuous heaps of the dying & dead. Interment could not do its work quick enough; even the days & jackals, the public scavengers of the East, become unable to accomplish their revolting work, and the multitude of mangled and festing corpses at length threatened the existence of the citizens." (WW Hunter P--19, Ref: letter of Council President to Court of Directors on 9/06/1770). ১৭৬৫

সালে যেখানে এই অংশে ৬০০০ কৃষক কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিলেন, ১৭৭১ সনে এই সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৪৫০০। এক তৃতীয়াংশ কৃষক ও জনবসতির অর্ধাংশ মৃত্যু মুখে বিলীন হয়, অনেকেই জীবনের আশায় শহরমুখী হয়। তৎসত্ত্বেও ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৭৭১ খ্রীঃ হিগিনসের রিপোর্টে দেখা যায়, শহরের এক চতুর্থাংশও জনপূর্ণ ছিল না। হেস্টিংসের অনুকূল রাজস্বনীতি সত্ত্বেও ১৭৭২ -৭৩ খ্রীঃ কৃষিতে একশর বেশী কৃষককে পুনরায় চাষ করতে উৎসাহিত করা যায়নি। এই সময় রাজস্ব দাবী ও আদায় ছিল নিম্নরূপ ঃ

সাল	রাজস্বদাবী	রাজস্ব আদায়
১৭৭২	£ ৯৯৪১৩	£ ৫৫১০৭
১৭৭৩	£ ১০৩০৮৯	£ ৬২৩৬৫
১৭৭৪	£ ১০১৭৯৯	£ ৫২৫৩৩
১৭৭৫	£ ১০০৯৮৩	£ ৫৩৯৯৭
১৭৭৬	£ ১১১৪৮২	£ ৬৩৩৫০

দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও প্রায় মানবশূন্য এই উপপ্রদেশে কৃষিতে আকাল চলে প্রায় ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত (সূত্রঃ বোর্ড অব রেভেনিউ প্রধান শোরকে লেখা কালেক্টচর কিটিং এর ১০ মে, ১৭৯০ খ্রীঃ পত্রাঙ্ক)। এই খাদ্য সংকটে কোম্পানী ছিল উদাসীন ও বিষ্ণুপুর রাজ ছিল নিজেই ঋণগ্রস্থ (নবাবী ঋণ ছাড়াও, ১৭৬৬ সনে কোম্পানীর আগমন, ১৭৭২ খ্রীঃ পাঁচশালা বন্দোবস্তে সম্ভবত জমিদারি হাতছাড়া)। তাই মানিকলাল সিংহ বর্ণিত মল্ল রাজার দুর্ভিক্ষকালীন ত্রাণকার্য্য অতিশয় উক্তি বলে মনে হয়। জমি অকর্ষিত থেকে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়। দেশ পরিপূর্ণ হয় বাঘ, হাতির মত জন্তুতে। কর্ণওয়ালিশ ২রা আগষ্ট, ১৭৮৯ পত্রাঙ্কে কোর্ট অব ডাইরেক্টরকে জানান প্রদেশের এক তৃতীয়াংশে ভূমি হল ‘a jungle inhibited only by wild beasts.’ পাশাপাশি জঙ্গলজন্তুদের হাত থেকে জন ও জনসম্পত্তি রক্ষার বিষয়টি ইংরেজ শাসকদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৯০ খ্রীঃ ২৯ডিসেম্বর ও ১৭৯১ খ্রীঃ ২৮ জানুয়ারীর বীরভূম কালেক্টরকে লেখা একাউন্টেন্ট জেনারেলের পত্র থেকে জানা যায় সরকার বাঘ মারার জন্য পুরস্কার ঘোষনা করেছিল এবং অর্থাভাবে অন্যান্য ধরনের খরচের উপর সরকারি স্থগিতাদেশ জারি হলেও এই পুরস্কার অর্থ বরাদ্দ কখনও বন্ধ হয়নি। বীরভূম কালেক্টরকে লেখা বের্ড অব রেভেনিউ-র ১১/০২/৮৯ ও ৩০/০৪/১৭৯০-র পত্রাঙ্কে জানা যায় ভূস্বামীদের দিয়ে বন থেকে কৃষি জমি পুনরুদ্ধারের কর্ণওয়ালিশের

ফরমান বিশেষ ফলপ্রসু হয়নি এবং সেনা সড়কের পুনরুদ্ধারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ৯ই অক্টোবর ১৭৮৯ খ্রীঃ কালেক্টর কিটিং বোর্ড অব রেভেনিউকে জানান যে জংলী জানোয়ারদের উপদ্রবে বহু গ্রাম জনশূন্য হয়েছে। শিল্প শহর পরিত্যক্ত হয়েছে, গরুর হাটগুলি বন্ধ হয়েছে এবং গোচারণ ভূমিগুলি পতিত ক্ষেত্র হয়ে গেছে।

রাজস্ব বোর্ড প্রধান জন শোরকে কিটিং এর লেখা ৩০ শে আগষ্ট ১৭৮৯ খ্রীঃ পত্রে এবং কিটিংকে লেখা বোর্ডের ১০ই মে ১৭৯০ খ্রীঃ পত্রে জানা যায়, দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সময়ে জমিদার শ্রেণী কৃষকদের সহজ শর্তে ও নামমাত্র রাজস্বে চাষ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। স্থায়ী স্থানীয় কৃষক, ও পরিযায়ী কৃষকদের কৃষিক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বীরভূম-বিষ্ণুপুর জেলায় ১৭৯২ সালে এ ধরণের ৩২৮ টি নতুন গ্রাম বসতি গড়ে ওঠে। সমকালীন এক সংবাদ প্রতিবেদনে জানা যায় সেনাসমাবেশ ও বহুযুদ্ধের সাক্ষী বীরভূম-বিষ্ণুপুরে, ১৭৮০ সনে সেনা সমাবেশের জায়গা ও সেনা সড়কের সংকট দেখা দেয়, কারণ সমস্ত জেলাই জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

মুর্শিদাবাদে কালেক্টরের পক্ষে দূরবর্তী প্রান্তিক দুই জেলা বীরভূম ও বিষ্ণুপুর শাসন কার্যত অসম্ভব ও বিপর্যয়কর ছিল। তাই (২৫ শে এপ্রিল ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) জি.আর.ফোলিকে বীরভূমের এবং ডবলু পাইকে বিষ্ণুপুরের কালেক্টর নিয়োগ করা হয়। ব্যায়সংকোচনের জন্য কালেক্টরের সংখ্যা কমলে বিষ্ণুপুর ও বীরভূম যুক্তকরে যুক্ত জেলার প্রথম কালেক্টর হন পাইসাহেব (২৯শে মার্চ ১৭৮৭ কলকাতা গেজেটের বিজ্ঞপ্তিমূলে)। পাইসাহেব বিষ্ণুপুর আক্রমনকারী পাহাড়ীয়াদের বিতাড়িত করতে বীরভূমে প্রবেশ করেছেন কিন্তু কখনও সেখানে স্থায়ীভাবে থাকেননি। তিনি বদলী সংবাদ পেয়েই অফিসের অধস্তন আধিকারিককে জেলার দায়িত্ব দিয়ে জেলা ত্যাগ করেন ১৯এপ্রিল ১৭৮৭ খ্রীঃ। তাঁর জায়গায় শোরবর্ণ দায়িত্বে আসেন ২৯ এপ্রিল ১৭৮৭ সনে (৪ঠা এপ্রিলের নিয়োগপত্র মূলে)। শেরবোর্ণের আমলেই বীরভূম-বিষ্ণুপুর যুক্তজেলার সদর শহর বিষ্ণুপুর থেকে সিউড়িতে সরিয়ে নেওয়া হয়।

জেলাগুলিতে দেশীয় প্রশাসক দ্বারা শাসিত হবার অব্যবহিত পরেই নিযুক্ত ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধিদের কাজ ছিল প্রশাসন যন্ত্রকে সংহত করা ও রাজস্ব বৃদ্ধি করন। বীরভূম-বিষ্ণুপুর যুক্ত জেলা তখনও পর্যন্ত পাহাড়ী দস্যু কবলিত, যা ১৭৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত জেলাকে সন্ত্রস্থ করে রাখে। কলকাতা গেজেট (১৬ই অক্টোবর ১৭৮৮) থেকে জানা যায় বীরভূম ট্রেজারীমুখী একটি রাজস্বদল মণিরামপুর থানার কাছে লুন্ঠিত

হয়েছিল। বিদ্রোহীদের কাছে রক্ষীরা পরাজিত হয়। পাঁচ জন নিহত হয়। ৩০০০০ সিক্কা ও তিন হাজার পাউন্ড মুল্যের রূপা লুষ্ঠিত হয়। দেশে শান্তি ফেরানোর পাশাপাশি শেরবোর্ণ ভূমি রাজস্ব ও আবগিরি রাজস্ব আদায়ে সচেষ্ট হয়। কিন্তু কোম্পানী তাঁকে দুর্নীতিতে যুক্ত আছেন এই সন্দেহে অপসারিত করে ক্রিষ্টোফার কিটিংকে ২৯ অক্টোবর ১৭৮৮ তারিখের আদেশনামানায় এই যুক্ত জেলার কালেক্টর নিয়োগ করে। তিনি কার্যভার নেন ডিসেম্বর মাসে। তিনি এই পদে ৬ই আগষ্ট ১৭৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত কাজ করেন (০১/০৫/ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের আদেশনামানায় মুর্শিদাবাদ আদালতের বরিষ্ঠ. বিচারক নিযুক্ত হন কিটিং)।

১৭৮৮ খ্রীঃ-এ কার্য্যভার গ্রহণের পর পাহাড়ী উপদ্রব ছাড়াও মল্লভূম ও রায়পুরের চুয়াড় বিদ্রোব দমন ছিল অন্যতম চ্যালেঞ্জ। সামরিক অভিযানের সাফল্যে জেলার শান্তি শৃঙ্খলা, কৃষিকাজ পুনঃস্থাপিত হচ্ছিল বলে রাজস্ববোর্ডকে লেখা কালেক্টর কিটিংএর ৩/৬/১৭৮৯ খ্রীঃ পত্র থেকে জানা যায়। এসময় ৩২৮ জন কৃষক কৃষিকাজে ফিরে এসেছেন বলে তিনি বোর্ডকে প্রতিবেদন পাঠান। উল্লেখ করা যেতে পারে একই সময়ে (১৭৮৯-৯১) রাইপুর অঞ্চলের দুর্জন সিংদের দমনে বাঁকুড়া শহরের সেনা শিবির থেকে কিটিং এর নেতৃত্বে পাতাকোলা রাইপুর সড়ক ধরে সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

কিটিং-এর কালেক্টরশিপে পাঁতশতাধিক বছরের পুরান মল্ল রাজবংশের সায়হ্ন ঘনিয়ে আসে। ক্লাইভ চৈতন্য সিংহকে সিংহাসনে পুরপ্রতিষ্ঠা করলেও দামোদর সিংহ আবার সিংহাসনের দাবী নিয়ে সক্রিয় হন ও মুর্শিদাবাদ রেসিডেন্টের এক অনুকূল রায়ে অর্ধেক জমিদারির মালিক হন। চৈতন্য এই রায়ের বিরুদ্ধে গভর্ণর জেনারেলের কাছে আপীল করেন। ১৭৮৭ খ্রীঃ সদর দেওয়ানী আদালত চৈতন্য সিংহের অধিকারের স্বীকৃতি দেয় ও দামোদর সিংহের ভাতা নির্দিষ্ট করেন। ১৭৯১ খ্রীঃ জমিদারি বিভাজনের পক্ষে একটি রায় বেরোয়, যাকে হান্টার অজ্ঞতা প্রসূত রায় বলেছিলেন। ইংরেজ শাসকদের মধ্যস্থতায় জমিদারির অধিকাংশই চৈতন্য সিংহের দখলে আসে। কিন্তু এর পরের ইতিহাস শুধুই মল্লনিয়ন্ত্রণ থেকে জমিদারি হারানোর ইতিহাস ।

মল্লরাজ শুধু এসময় পারিবারিক কলহ জর্জরিত ছিলেন তাই নয় দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কর আদায়েও ছিলেন অক্ষম। অনাদায়ী রাজস্বের জন্য তিনি ৮০ দশকে দুইবার ও ১৭৯০ সালে ১ বার কারারুদ্ধ হন। এমনকি তার নিরাপত্তা ব্যয় কেড়ে নেওয়া হয়। ১৭৮৯ খ্রীঃ কোম্পানীর কাছে তাঁর বকেয়া দাঁড়িয়েছিল ৫০,০০০

টাকা, তৎসত্ত্বেও দামোদর সিংহকে রোখার জন্য কোম্পানীর কাছে চারলক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান শর্তে জমিদারি বন্দোবস্ত করেন। এরপরই ৫লক্ষ ৪৫হাজার ৮০১ একর জমিদারির অবক্ষয়ের ইতিহাস শুরু হয়। জমিদারির বিভিন্ন অংশ অনাদায়ী রাজস্ব উদ্ধারে নীলাম হতে থাকে। ১৭৯১ খ্রীঃ ১৩১৯৪৩.৫ একরের বরহাজরী মহল ১৯২৬৩৩ টাঃ ৫আনা ৯গন্ডায় এবং করিশুন্ডা মহল (১৩১২৯ একর) ২১৩৯৫ টাকা ৫ আনায় বর্ধমান জমিদারের কাছে বিক্রিত হয়।

মল্লরাজের দেয় রাজস্ব চারলক্ষ টাকা থেকে এই ২১৪০২৮ টাকা ১০ আনা ৯ গন্ডা ও ১৭৯০ সালের দশশালা বন্দোবস্তের সময় ভুল করে আরোপিত ২০৪৬৭ টাকা রাজস্ব কমিয়ে দিলেও, চৈতন্য সিং তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। মামলা মোকদ্দমা-রাজস্বআদায় ও প্রদানে ব্যর্থতা রাজাকে আরো ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

১৭৯৩ খ্রী জুনমাসে (১১ জানুয়ারীর সরকারী নির্দেশ বলে) বিষ্ণুপুর অঞ্চল বীরভূম কালেক্টরশিপ থেকে বর্ধমান কালেক্টরশীপে অন্তর্ভূক্ত হয়। বর্ধমান কালেক্টর স্যামুয়েল ডেভিস এক প্রতিবেদনে কোম্পানীকে জানান ১৭৯০ খ্রীঃ দশশালা বন্দেবস্তে নির্ধারিত খাজনা অযৌক্তিক ও অতিরিক্ত, অতএব এই অতিরিক্ত খাজনা অনাদায়ে বিষ্ণুপুর জমিদারির নীলামী অংশের দরুণ তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। (পত্রাঙ্ক ১২/০২/৯৪, রাজস্ববোর্ডকে)।

কোম্পানী কালেক্টর ডেভিসের বক্তব্য খারিজ করে অনাদায়ী রাজস্বের জন্য জমিদারি বিক্রয় চালাতেই থাকে। (সূত্র ঃ জন ডীনের লেখা বর্ধমান কালেক্টর আর আয়ারল্যান্ডকে ৯জুন ১৭৯৭ সালের পত্রাঙ্কে ও সিবুলারের কালেক্টরকে লেখা ১৬/০২/৯৮ পত্রাঙ্ক)। ১৭৯৮ খ্রীঃ ১২২৩৫৪.৫ একর জঙ্গল মহল বর্ষিক ৩৪৯৯ টাঃ ৪ আঃ ৬গঃ বর্ধমান রাজের কাছে, ৮৫৪২.৫ একর কুচিয়াকোল ৮২৩৭ টাঃ ১০ আঃ রাজস্বে জমিদার পুত্র নিমাই সিংকে বিক্রয় করা হয়। সঙ্গে বিক্রয় হয় ৪৯৩ একর পাঁচাল ৪০৮ টাঃ ৯আঃ ৯গঃ রাজস্বে; ৯৫৭৫.৫ একর জামতরা ৬৩১০ টাঃ ৯আঃ ৬গঃ রাজস্বে। তাছাড়া ছোট ছোট অংশ কাশীনাথ ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, গৌরীচরণ চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন কিনে নেন। রাজস্ব বোর্ডের আর এক আদেশে ৩২০৪৩.৫ একর মালিয়ারা ৫২০২ টাঃ ৮আঃ ৯গঃ রাজস্বে স্বতন্ত্র তালুকে এবং ১৬৩.২৩ একরের বাহারজোড়া ১১৫৬ টাঃ ১০আঃ ৮গঃ রাজস্বে নীলাম হয়।

চৈতন্য সিংহ এ সময় যেমন আর্থিক সংকট কাটানোর মরিয়া চেষ্টা চালান, তেমন নীলামে জামিদারি যাতে নতুন জমিদার দখল নিতে না পারে তার চেষ্টা চালান। বিষ্ণুপুর জমিদারির অধীনস্ত আদায়কারী ভূস্বামীরা এসময় পারস্পরিক

হানাহানি ও গ্রাম লুণ্ঠনে মেতে ওঠে। (সূত্রঃ বর্ধমান ম্যাজিস্ট্রেট জি সিম্পসনকে লেখা বর্ধমান কালেক্টর ওয়াই বার্গেসর পত্রাঙ্ক ২১/০৯/৯৯ পত্রাঙ্ক ও ডাব্লিউ কুপারকে লেখা বার্গেসের ২৪/০৯/৯৯ পত্রাঙ্ক-সাজোয়াল রামকান্ত দাসের প্রতিবেদন সহ।) ১৭৯৯খ্রীঃ সেজোয়াল জীবনলাল সরকার জানিয়েছেন বিষ্ণুপুরবাসীরাও লুণ্ঠনের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। ১৭৮১খ্রীঃ রাজস্ব বোর্ডের কাছে ভাগবত শর্মা, দোস্ত মহঃ, জীবনরাম চন্দ্র প্রমুখ মল্লরাজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে রাজা অতিরিক্ত ২টাকা করে গৃহকর আদায় করছেন এবং অনাদায়ী রাজস্বের জন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উপর জোরজুলুম করেছেন। ১৭৯০খ্রীঃ বেলিয়াতোড়ের লালমোহন রায়েরা অভিযোগ করেন যে দেওয়ান রাম কানাই কর, নিষ্কর মোকাবরীও অন্য মহলগুলি থেকে কর আদায় করতে চাইছেন। চৈতন্য সিংহ কোম্পানী রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার জন্য অনেক গ্রাম, মহল দেবোত্তর-ব্রহ্মোত্তর করে দেন। যেমন ডমন সিংহ ঠাকুরের ১৯টি গ্রাম ও পুত্র নিমাই সিংহের এলাকা। বর্ধমান কালেক্টর বার্গেস এর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেবার কথা বলেন।

এলাকাগত অশান্তির জন্য কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, গৌরীচরণেরা জমিদারির দখল নিতে পারছিলেন না। বর্ধমানের জমিদার ও জামতারার হরিদাস পাঠক একই সমস্যার সম্মুখীন হন। যদিও রাজস্ব আদায়ে মল্লরাজবংশের বাধা বিপত্তি সম্পর্কিত বর্ধমানরাজের অভিযোগকে কালেক্টর এরনষ্ট 'অতিরঞ্জিত' অভিহিত করেছিলেন। ১৮০২ খ্রীঃ চৈতন্য সিংহের মৃত্যু হলে পুত্র মাধব সিংহ জমিদারি রক্ষা করতে অক্ষম হলেন। ১৮০৬খ্রীঃ ১২নভেম্বর বাকী জমিদারি (২০৬৪৭১.৫ একর) বর্ধমান রাজ তেজচাঁদ ১৩৬৯৮৯ টাঃ ৬আঃ ৫গঃ বার্ষিক রাজস্ব কিনে নিলে মল্লরাজত্বের শেষ চিহ্ন অপসৃত হয়। কিটিং প্রশাসন দেখভাল ও কর আদায়ের জন্য বিষ্ণুপুরে এক বরিষ্ঠ ক্যাপ্টেনকে নিয়োগ করেন "to station a military guard with an officer at Bishnupore, where sole business I propose to be that of receiving all thieves & dacoits that shall be sent in." ১৭৯০ খ্রীঃ অনাদায়ী খাজনার জন্যে চৈতন্য সিংহ কারারুদ্ধ হলে কালেক্টর কিটিং মুখ্য সহায়ক আর্থার হেসিল রিজকে বিষ্ণুপুরের প্রশাসক নিয়োগ করেন। (রিজ ২৫এপ্রিল ১৭৮৬ থেকে ৯জুলাই ৮৬ পর্যন্ত বীষ্ণুপুর-বীরভূম যুক্তজেলার অস্থায়ী কালেক্টর ছিলেন এবং পরে আর্থিক তছরূপের অভিযোগে অপসৃত হন। তদন্ত শেষে অবশ্য তিনি এই অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে ১মে ১৭৯৩ খ্রীঃ যশোরের জেলাশাসক নিযুক্ত হন।)

অশান্ত বিষ্ণুপুরে বিদ্রোহ সংঘটিত করার ক্ষেত্রে শেষ জমিদার মাধব সিংহের ভূমিকা ছিল। প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে এছিল শেষ স্ফুরণ। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে প্রাপ্ত রেকর্ডএ দেখা যায় বিষ্ণুপুর, ওন্দা, সুরুল, সোনামুখী, পাত্রসায়রে মল্লরাজদের প্ররোচনায় বিদ্রোহী ও চুয়াড়ারাও সংগঠিত হচ্ছিল। চৈতন্য সিংহ যখন ঋণের বোঝা নিয়ে ইন্দাসে অবস্থান করছিলেন, তখন সাজোয়াল রামকান্ত দাস রাজস্ব সংগ্রহার্থে সেখানে গেলে তীর ধনুক নিয়ে মাধব সিং-নিমাই সিংহরা তাদের বাধা দেয়। জমিদারি দখল ও রাদস্ব আদায়ে মল্লবংশ কতৃক বাধাপ্রাপ্ত জমিদার শ্রেণী কোম্পানীর কাছে নিরাপত্তা ও সেনাশাসন চাইতে থাকেন।

১৭৯৯ খ্রীঃ ৭ ফেব্রুয়ারী ওন্দা ক্যাম্প থেকে লেঃ কমান্ডার আর স্পটিশউড বিষ্ণুপুর শাসক সি আর ব্লান্টকে যে প্রতিবেদন পাঠান তাতে বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে অনুমান করা যায়। এই প্রতিবেদনে লেখা ছিল, “আমাকে জানান হয়েছে যে ডোমপাড়া জঙ্গলে ওন্দার পশ্চিমদিকে কয়েকক্রোশ দূরে দুইশতাধিক চুয়াড় সমবেত হয়ে এই জেলায় অভিযান করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সকাল হওয়ার পূর্বেই তাদের হতভম্ব কারার নিমিত্ত আমি তৎক্ষণাৎ অভিযান করলাম। আমার Hircarrah রাস্তা ভুল করার জন্য সূর্যোদয়ের আগে আমি পৌছাতে পারলাম না। পৌঁছে দেখলাম অধিকাংশ চূয়াড় স্থান ত্যাগ করেছে। কেবলমাত্র ২৫-৩০ জন চুয়াড় আছে। তাদের সঙ্গে একটি বালক আছে। বালকটি হচ্ছে বিষ্ণুপুর রাজার পরিবারের কোনও বংশের একদা ছেলে। ঘোড়া দ্রুত ধাবমান হওয়ায় তাদের ৭জনকে এবং বালকটিকে ধরে ফেলতে সক্ষম হলাম। যাদেরকে প্রথমে বিষ্ণুপুরে পাঠিয়েছি, পরে বর্ধমানে চালান করা হবে।

আমাকে জ্ঞাত করা হয়েছে যে এই জেলায় আক্রমনের জন্য ডোমপাড়া জঙ্গলের চতুর্দিকে একটি ভয়ানক শক্তিশালী দল তৈরী হচ্ছে। যদি তাই হয় তাহলে দেশের এই অংশের রক্ষার নিমিত্ত অতিরিক্ত সৈন্যদলের অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন আছে। বিষ্ণুপুর রাজার ছেলে মাধব সিংহ নিম্নলিখিত জমিদারদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এই কাজে নিযুক্ত আছে। তারা বর্তমানে দেশলাই কাঠি এবং লৌহের টুকরো বা যন্ত্রাংশ হাতে গোলা তৈরী করছে। এগুলি তারা নিকটবর্তী স্থান হতে বহন করে নিয়ে গেছে এই ভেবে যে উপরিলিখিত মাধো সিং দুদিন পূর্বে বিষ্ণুপুর হতে তার পরিবারকে স্থানান্তরিত করেছে।

আমি হঠাৎ একটি সংবাদ পেলাম যে চুয়াড়গণ আগামীকাল বিষ্ণুপুর লুঠপাট করতে মনস্থ করেছে। এই স্থানের নিরাপত্তা জন্য ৪৬ জন সঙ্গীসহ একজন সুবেদার

সেখানে রাখলাম। আমি তড়ার দারোগার সহায়তার নিমিত্ত সঙ্গীদের প্রেরণ করতে সুবেদারকে নির্দেশ দিয়েছি, যেহেতু দারোগা আমাকে জানিয়েছে যে চুয়াড়গণ উপস্থিত হয়েছে এবং তার কর্মস্থলের নিকট একটি গ্রামকে পুড়িয়ে দিয়েছে।"

এই প্রতিবেদন সদর দপ্তরে পাঠান হয়। বর্ধমানের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের উল্লিখিত পত্রানুযায়ী কমান্ডার-ইন-চিফ, বোর্ডকে জানান যে মেদিনীপুরের কমান্ডিং অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে অনতিবিলম্বে এক কোম্পানী সিপাহী বিষ্ণুপুরে লেঃ স্পার্টিশউডের অধীনে যে বাহিনী আছে সেখানে পাঠান হয়। মল্লবংশ পরিচালিত এই চুয়াড় বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়।

<u>ক্রিষ্টোফার কিটিং-এর কালেক্টরশিপে বীরভূম-বিষ্ণুপুর যুক্তজেলার বিচার ব্যবস্থা, পুলিশ, রাজস্ব ব্যবস্থা ও মুদ্রা ঃ কমার্সিয়াল রেসিডেন্ট</u>

কিটিং-এর সময়ে যুক্ত জেলার আয়তন ছিল ৭৫০০ মাইল এবং প্রাশাসনিক খরচ ছিল £৫৪০০ স্টারলিং প্রতি বর্গ মাইলে (মাসিক ৪৩৯৪ সিক্কাটাকা)। ১৭৮৮খ্রীঃ এই প্রশাসনিক খরচের ও ভূমিরাজস্ব আদায় কার্যে ব্যয় £৪৫০০, দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার জন্য খরচ £৭০৮। ফৌজদারি প্রশাসনে খরচ £৩২৮।

যুক্ত জেলার বীরভূম অংশের ভূমিরাজস্ব এসময় ছিল বার্ষিক £৬৫০০০ (বনপাহাড় সমেত ১২ পাউন্ট প্রতি বর্গমাইল)। বিষ্ণুপুর অংশে এই রাজস্ব ছিল £৪০০০০ (£১৭.৪ প্রতি বর্গমাইল)। রাজস্ববোর্ড সভাপতি জন সোরকে লেখা কিটিংএর ১৩/০২/৮৯, ১৪/০৪/৯০, ২৫/১০/৯০ তারিখের পত্রাঙ্ক থেকে বোঝা যায় অধিকাংশ সময়েই আরোপিত কর অনাদায়ী থেকে যেত ও আদায়ে সামরিক সাহায্য দিতে হত। বছরে বছরে করহার পরিবর্তন করা হত। ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৭৮৯ খ্রীঃ রাজস্ব বোর্ডকে লেখা কিটিংএর পত্র থেকে জানা যায় সে বছরের বর্ধিত কর কৃষকরা দিতে অস্বীকার করে যেহেতু শষ্য বপনের পর এই হার বৃদ্ধি হয়েছিল। অস্বীকৃত কৃষকদের অনেকেরই স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সন্নিহিত জেলায় থাকায় তাদের সম্পত্তি ক্রোকও করা যায়নি। অনেক ক্ষেত্রে সন্নিহিত জেলা কালেক্টররা দুর্ভিক্ষজনিত মানব সংকট কাটানোর জন্য এদেরকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৭৮১ সালে বর্ধমান কালেক্টরকে এধরনের কৃষকদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যুক্তজেলার কালেক্টর পত্রাচার করেছিলেন। ১৭৮৯খ্রীঃ কৃষিরাজস্বের এই সংকট সমাধানে কিটিং রাজস্ব বোর্ডের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন (পত্রাঙ্ক ১০/০৫/৯০)। এই প্রশ্নে রাজস্ববোর্ড কৃষকদের পক্ষে রায় দেয়। এই রাজস্ব আরোপে দায়ী আধিকারিক আর্থবিটন বদলি

নিয়ে জেলা থেকে দ্রুত প্রস্থান করেন। এমনকি আর্থবিটন যাবার আগে জেলাশাসকের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতও করেননি। এরপরেও রাজস্ব আদায়ে সরকারী জুলুম অব্যাহত থাকে, এমনকি রাজস্ব খেলাপী বিষ্ণুপুর রাজ ও বীরভূমরাজকেও কারাবন্দী করা হয়। (সূত্রঃ পত্রাঙ্ক ১০/০২/৮৯ ও ১২/০১/৯১, ০১/১১/৯১ তারিখের কোম্পানী প্রতিবেদন)।

১৭৮৭ খ্রীঃ কালেক্টর শেরবোর্ণ আবগিরি রাজস্ব আদায়ে যত্নবান হন এবং জেলাশহরে দোকান প্রতি ১পাউন্ড, অন্যত্র দোকান প্রতি ৮সিলিং হারে কর আরোপ করেন। বিষ্ণুপুর রাজের আরোপিত কর ছিল ২-৪ শিলিং প্রতি দোকান। খোলাপী বিক্রেতাদের মহামেডান বিচারকের কাছে পাঠান হত। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যুক্ত জেলায় এই খাতে আয় ছিল £৩৩০। এ সময় ১ম শ্রেণী পাক্কির (মদ) দাম ছিল কোয়ার্টপ্রতি ১$\frac{১}{২}$ ডি, ২য় শ্রেণীর পাক্কি $\frac{৩}{৪}$ ডি (প্রতি কোয়ার্ট বোতল)। পাচুই $\frac{১}{২}$ ডি (প্রতি গ্যালন)। অন্ত্যজ মানুষদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রভাব অপরাধিত্বের জন্ম দিয়েছিল। কিটিং ২২ মে ১৭৯০ খ্রীঃ বোর্ড অব রেভেনিউকে জানান ডাকাতি সহ বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে মদ ও ভাঙ খেয়ে অপরাধীরা কাজে নেমেছে। পাচুইয়ের দাম কম থাকায় তা বিক্রির হারও ছিল বেশী। আবগিরি রাজস্ব বিষয়ে রাজস্ব বোর্ড মত দেন "to raise as large an amount of revenue from intoxicating liquiors and drugs as is compatible with greatest possible discouragement of their use." এ সময় নথিভূক্ত অপরাধের নয় দশমাংশই ছিল মারধোর ও মারপিটের ঘটনা।

তৎকালীন জেলা প্রশাসনের আয়ের আর একটি উৎস ছিল মন্দির কর। মূলত দেওঘরের (তৎকালীন বিষ্ণুপুর-বীরভূম জেলার অন্তর্ভূক্ত) মহাদেব মন্দির থেকে কর আদায়ে কালেক্টর কিটিং ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে হেসেলরীজকে প্রেরণ করেন ও ১৭৯১ খ্রীঃ ২১ ফেব্রুয়ারী কর আদায় নিশ্ছিদ্র করতে নিজে দেওঘরে যান। পূণ্যার্থীরা যাতে মন্দিরে প্রণামী দেওয়ার আগেই লুণ্ঠিত না হন তার জন্য সড়কপথে সামরিক প্রহরার ব্যবস্থা করেন। বিষ্ণুপুরের মন্দির থেকে কর আদায়ের তেমন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। ১৭৮৯ খ্রীঃ যুক্ত জেলায় মন্দির করের মোট আদায় ছিল £৪৩০। তবে ১৭৮৯ খ্রীঃ ১০ সেপ্টেম্বর হেসেলরিজ, কালেক্টর কিটিংকে লিখেছিলেন, "তীর্থযাত্রীদের দান-দক্ষিণা-প্রণামী মল্লরাজের সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল।" তিনি মত দেন যে, কলকাতায় থাকা মদনমোহন বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে ফিরিয়ে আনলে তা জেলার সম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হবে। ১৭৯০ খ্রীঃ মন্দির কর আদায় হয়েছিল £৯০০

এবং ১৭৯১ খ্রীঃ প্রত্যাশিত মন্দির কর ছিল £১২০০।

তৎকালীন কালেক্টরকে রাজস্ব আদায় ছাড়াও ট্রেজারী-ব্যাঙ্কের হিসাবরক্ষকের কাজও করতে হত। ১৭৮৮-৮৯ খ্রীঃ বীরভূমের ভূমিরাজস্ব আদায় ছিল ৬১১৩২১ টাঃ ৭আঃ ১৬গঃ এবং বিষ্ণুপুরের ভূমিরাজস্ব আদায় ছিল ৩৮৬৭০৭ টাঃ ১১আঃ ৭গঃ। যুক্তজেলার মোট আদায়কৃত রাজস্ব ছিল ৯৯৮০২৯ টা ৩আঃ ৩গঃ। ট্রেজারিতে মোট জমা অর্থ ছিল £১০০০০০ যার মধ্যে কোম্পানীর নিয়মানুসারে £৫০০০ — £৭০০০ জমা রেখে বাকী টাকা কলকাতা বা অন্য ট্রেজারীতে চালান করার কথা। ১৭৯০ খ্রীঃ ট্রেজারীতে £১৯০০০ পড়ে থাকলে রাজস্ব বোর্ডের হিসাবরক্ষক ক্যাডলেকট কালেক্টর কিটিংকে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৭৯০ খ্রীঃ কারণ দর্শাতে বলেন। টিপু সুলতানের সাথে কেম্পানীর যুদ্ধে প্রচুর অর্থের যোগান দিতে গিয়ে বাংলার কোম্পানী ট্রেজারীরর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ১৫ নভেম্বর ১৭৯০ খ্রীঃ কোম্পানী ট্রেজারীকে অর্থপ্রদান বন্ধ করতে বললে বিপদগ্রস্থ শিল্পী ও কৃষকের ট্রেজারি ঘেরাও করে তাদের সংকটের কথা তুলে ধরে।

শেরবোর্ণের কালেক্টরশিপে ট্রেজারিদলের কাছ থেকে পাহাড়ী দস্যুদের £৩০০০ লুণ্ঠনের ঘটনার পর কিটিং সমগ্র টাকা-পয়সা পরিবহনের ক্ষেত্রে সামরিক প্রহরার ব্যবস্থা করেন। এমনকি একবার মুর্শিদাবাদে £২০০ পাঠাতে একজন আধিকারকের নেতৃত্বে ৫জন রক্ষী দিয়ে পাঠান হয়। তৎকালীন সামরিক ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ (২০ সিপাই এর পল্টন)

১ জমাদার	S.R. ১৩	
১ হাবিলদার	S.R. ৯	
১ নায়েব	৭	
২০ সিপাই	১০০	(S.R. ৫ হারে)
মাল বাবদ	৬	
মোট	S.R. ১৩৫	

৬০ সিপাহি ৯ আধিকারিকের এককালীন সেবামূল্য ছিল £৫২।

কোম্পানী আমলে আদায়কৃত রাজ্যস্বের প্রায় সবটাই ব্যবহৃত হয় বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং জেলায় বাণিজ্য পরিচালনা করত কমার্সিয়াল রেসিডেন্ট। যেখানে কালেক্টর কিটিং-এর পাবলিক পার্স ছিল £৩০০০ মাত্র, চীপের বার্ষিক খরচের বহর ছিল £৪৫০০০ থেকে £৬৫০০০। চীপ যেখানে বাণিজ্য কর্মী নিয়োগ করতেন

অবাধে, কিটিং কর্মী নিয়োগ করতে পারতেন কোম্পানীর অনুমোদন সাপেক্ষে। বিচারের আইনী ক্ষমতা কিটিংএর থাকলেও, জনতা বিবাদ সালিশির জন্য 'মহামতি' চীপের দরবারে হাজির হত। এমনকি বীরভূম জঙ্গলে "মালবেরী রেশমের" চাষ করতে আসা অসরকারী ইংরাজ বণিক ফ্রুসাডের বাড়াবাড়ি ও কিটিং-এর সাথে তার মতবিরোধের সময়, কোম্পানী ফ্রুসাডের স্বার্থরক্ষাতেই উৎসাহী ছিল।

কালেক্টর কিটিং ও বাণিজ্য প্রধান চীপের অবস্থানের পার্থক্য বোঝাতে হান্টার সুন্দরভাবে লিখেছিলেন, "Mr. Keating complaining that he can barely subsit on his salary; that the mud tenement in which the collectors lived was letting in water, and tumbling down upon his head; and petitioning in vain for a single rood of land on which to build a house. Mr. Cheap, on the other hand, not only made a fortune and bequeathed lergest indigo plantations in that part of Bengal, but meanwhile lived sumptuously in a pile of buildings sorrounded by artificial lakes and spacious gardens, and defended by a strong wall which gave the commercial residency a look less of a private dwelling than of a fortified city. The ruins crown the top of a hill visible for many miles & cover as lage a space as the palaces, pavilions, and mausoleums which the princes of Beer bhoom had erected during two hundred years."

চীপের অধীন তিনটি বৃহৎ কারখানা ও ১২টি ছোট কারখানা ছিল। রেশম তন্তু, বস্ত্র, আঠা-লাক্ষা প্রভৃতি ব্যবসায়ে কোম্পানী জড়িত ছিল। চীপ নীল ব্যবসায়েও জড়িত ছিলেন। বেতনভুক বণিক ও আবেতনভুক বিক্রেতা ছিল কোম্পানী ব্যবসায়ের দুই শ্রেণী। রেসিডেন্ট, সিনিয়র মার্চেন্ট, জুনিয়র মার্চেন্ট, ফ্যাক্টর, সাবফ্যাক্টর ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত। ১৮১৩ সালে সোনামুখীর মুখ্য কারখানা ছাড়াও ৩১টি অধীনস্ত কারখানার কথা জানা যায়। যেমন সুরুল, ইলামবাজার, পাত্রসায়র। সুরুলের বৃহৎ চিনি কারখানা ছাড়াও সোনামুখী, পাত্রসায়র, বিষ্ণুপুরে ছোট চিনি কারখানা চালাত কোম্পানী। বিষ্ণুপুর জেলায়এসময় কৃষকদের আখ চাষে উৎসাহিত করা হয়। ১৭৯৭ খ্রীঃ ডিসেম্বরে সোনামুখী বাণিজ্য কেন্দ্রে চীপসাহেব রেসিডেন্ট মনোনীত হন।

কিটিং-এর সময়ে বিভিন্ন মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকায়, নানা অসুবিধার কথা তিনি কোম্পানীর গোচরে আনেন (সুত্র ঃ কালেক্টরকে রাজস্ববোর্ডের পত্র সংখ্যা ২৩/০৬/৯০ এবং ২১/০৭/৯০ ইত্যাদি)। অবশেষে কোম্পানী একটি নির্দেশে ১০ এপ্রিল ১৭৯৪ থেকে অভিন্ন মুদ্রা ব্যাবস্থা চালু করে ও নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে পুরান চালু মুদ্রা পরিবর্তনের সুযোগ দেয়। এই চরমসীমা সম্পর্কে কোম্পানী জানায় "no person should be permitted to recover any sum of money under a bond or other writing, by which any species of rupees, excepting the sicca rupees of the 19th sum is stipulated to be paid."। যাই হোক ১৭৯৪ খ্রীঃ এই সময়সীমা এক বছর বাড়িয়ে নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু করা হয় (২৮জুন ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী ঘোষণা)।

শতাব্দীর শেষ দুই দশকের অরাজক নবাবী শাসনে বিচার ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছিল। রাজস্ব আদায়কারী কোম্পানী নবাবকে বিচার ও নিরাপত্তা ব্যায় হিসাবে বার্ষিক £৩৬০০০০ প্রদান করলেও দেশ থেকে বিশ্বাসযোগ্য বিচার ব্যবস্থা অন্তর্হিত হয়। জেলা মুসলিম আইন আধিকারিকের কাছে অনেক মামলা জমলে তবে তা মুর্শিদাবাদে পাঠান হত। নবাবী বিচারক মাঝে মধ্যে বিচারে বসতেন। কারাদন্ড হলে তার মেয়াদ থাকত অনুল্লেখিত। যে সব অপরাধীর সাক্ষ্য থাকত না তাদের সাক্ষী সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত কারাদন্ড ভোগ করতে হত (সূত্র ঃ এ্যাননালস অব বেঙ্গল)। ১৭৮৭ থেকে ১৭৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত যুক্ত জেলার গড় মামলা ছিল বার্ষিক ১১২ টি। বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি ফৌজদারি পুলিশের ব্যবস্থার অস্তিত্বও নবাবী অবহেলায় বিপন্ন হয়। নবাবী অবহেলায় জেলের অবস্থাও জরাজীর্ন হয়ে পড়ে। কয়েদীদের বেঁধে রাখা হত বা ছোট ঘরের গাদাগাদি করে রাখা হত। যার ফলে অনেক কয়েদিই মৃত্যুমুখে পতিত হত। জি এ বার্লো, সাবসেক্রেটারীর সরকারকে প্রেরিত ০৩/০২/১৭৯২ পত্রে জানা যায় "to keep prisoners in stocks or fetters, of to fasten them down with bamboos, or to shut them up in cells or close apartment at night.... not on account of the suit or charge on which they are confined, but merely because, from the insecurity of the Jails, the jailor had no other means of preventing their cscape."

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে বিচার ব্যবস্থার পুররুজ্জীবনে পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়। ১৭৭২ খ্রীঃ কোম্পানীর উদ্যোগে ২১ শে আগষ্ট দেওয়ানী ও ফৌজদারি

বিচারের জন্য কতকগুলি সাধারণ বিধি পাশ হয়। জেলাস্তরে ফৌজদারি মামলার বিচার ক্ষমতা ন্যস্ত হয় কাজী ও মফুতির উপর। তারা মৌলবীর সহায়তায় ফৌজদারি বিচার পরিচালনার ক্ষমতা পান। ১৭৮১ খ্রীঃ ৬ই এপ্রিলের বিধি বলে বাংলায় যে তেরটি দেওয়ানি আদালত স্থাপিত হয়েছিল, বিষ্ণুপুরের ক্ষেত্রে তা ছিল বর্তমান পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে। ১৭৭২ খ্রীঃ কলকাতায় সুপ্রিম ক্রিমিনাল কোর্ট স্থাপন করা হয় ও জেলা গুলিতে অধীনস্ত ট্রাইবুনাল গঠিত হয়। কিন্তু ১৭৭৫ খ্রীঃ কলকাতা থেকে সুপ্রিম আদালত নবাব দরবারে স্থানান্তরিত হয়। হেস্টিংসের সময় বিচার সংস্কারের প্রচেষ্টা পুরোপুরি ফলপ্রসু না হলেও ১৭৯০ খ্রীঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশ, বিচার ব্যাবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন আনেন। কলকাতায় গভর্নর জেনারেল ও বার কাউন্সীলের নেতৃত্বে সুপ্রিম ফৌজদারী কোর্ট স্থাপিত হয় এবং দুই অভিজ্ঞ বিট্রিশ আধিকারিকের পরিচালনায় ৪টি সারকিট কোর্ট স্থাপিত হয়। ছোট অপরাধের বিচার করতেন কালেক্টর (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) নিজে। অন্যান্য বিচার হত মহামেডান আইনজ্ঞের পরামর্শ মোতাবেক ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে। জেলা কোর্টে ছিলেন জেলা জজ, মুখ্য সদর আমিন, সদর আমিন, ছয় মুন্সেফ। ছোট অপরাধ ও রাজস্ব মামলার নিস্পত্তি করতেন কালেক্টর। তবে কালেক্টর কোর্টে কালেক্টরদের অন্যবিধ ব্যস্ততার জন্য এ ধরণের মামলার নিষ্পত্তি বিলম্বিত হত। ১৭৯১ খ্রীঃ ১লা ডিসেম্বর এসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে ১২ টি মামলা ছিল ১৭৯২ খ্রীঃ ২৪ জুলাইয়ের হিসাবে দেখা যায় তার একটিরও শুনানী পর্যন্ত করা হয়নি। বিচারের দীর্ঘ সূত্রিতার বড় উদাহরণ ছিল বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্য সিং ও দামোদর সিং-এর জমিদারি মালিকানা সংক্রান্ত মামলা।

মামলার রায় যখন জানা যায়, একজন রাজস্ব অনাদায়ে জেলে, অন্যজন মৃত্যু শয্যায়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভায়ায় "will you believe it that the boys of the service are the sovereign of the country, under the unmeaning title of supervisors, collectors of the revenue, administrator or of justice, and rulers, heavy rulers, of the people?"

নবাবী অবহেলায় উপজেলাস্তরের নবাবী সময়কালের ফৌজদারি থানার কার্যত বিলোপ ঘটলে ইংরেজ প্রবর্তিত রাজস্ব-থানেদারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া বিচার বিভাগকে সাহায্য করার মত কোন প্রতিষ্ঠান এইস্তরে ছিল না। এই থানার থানেদার ও অন্যকিছু কর্মী ছিলেন বেতনভূক বা সরকার প্রদত্ত বিনিময় জমির মালিক। বাকিরা ছিল জমিদার সাহায্যপুষ্ট গ্রাম্যরক্ষীর দল।

ছয়ের দশকের বর্গী হাঙ্গামা, সাতের দশকের সন্ন্যাস ও নয়ের দশকের পাহাড়ীয়া আক্রমণ, আট ও শেষ দশকে চুয়ার বিদ্রোহের অভিঘাতে দীর্ণ এই ভূখণ্ডের অস্তিত্বও অবলুপ্ত হয় ১৭৯৩ খ্রীঃ ১১ জানুয়ারীর সরকারী আদেশনামায়। এই আদেশে বিষ্ণুপুর রাজ্য বর্ধমান জেলায় অঙ্গীভূত হয় এবং ১৭৯৩ খ্রীঃ ২৭শে ডিসেম্বরের নির্দেশ বলে শ্যামসুন্দরপুর, রায়পুর, ফুলকুসুমাস সিমলাপাল, ভোলাইডি মেদিনীপুর জেলায় স্থানান্তরিত হয়। এই সিদ্ধান্ত ছিল বাঁকুড়া জেলার আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে একটি আঘাত (সূত্রঃ রাজস্ব বোর্ডকে লেখা কালেক্টরের পত্র, তাং ১৫/১০/১৭৯০ ও ২৫/১২/১৭৯১)। বিদ্রোহক্লান্ত কালেক্টর (মেদিনীপুর) উইলিয়াম ষ্ট্রেচি ১৩ এপ্রিল ১৮০০ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়ামকে জানান দেশে শান্তি ফেরাতে হলে পূর্বতন জমিদারদের প্রতি নমনীয় মনোভাব নিতে হবে। পাইকান চাকরান সম্পত্তি ফেরাতে হবে। ঘটোয়ালদের পুলিশি আধিকার অংশত ফেরাতে হবে। দারোগাদের নিরস্ত ও নব্য জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ইংরেজ প্রশাসকদের এই নয়া উপলব্ধি দেশের বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা নেয়।

১৭৬০ খ্রীঃ থেকে ১৭৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত বাঁকুড়ায় ইংরেজ প্রশাসকদের তালিকা

নাম	পদ	সময়কাল
জন জনস্টোন	রেসিডেন্ট-মেদিনীপুর	১৭৬০
জন গ্রাহাম	রেসিডেন্ট-মেদিনীপুর }	১৭৬৫
হ্যারি ভেরেলস্ট	সুপারভাইজার মেদিনীপুর }	১৭৬৫
আলেকজান্ডার হিগিনস	সুপারভাইজর / কালেক্টর বিষ্ণুপুর ও বীরভূম	১৭৭১
ক্যাপ্টেন কারনাক	চীফ / ডিসি — প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭৭৩
ডসন	চীফ / রেসিডেন্ট- প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭৭৫
এরনস্ট	চীফ / রেসিডেন্ট- প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭৭৫
এডোয়ার্ড অটো	কালেক্টর—মুর্শিদাবাদ জেলা	১৭৮৪-৮৫
ডব্লুই পাই	কালেক্টর— বিষ্ণুপুর জেলা	২৫/৪/৮৬-২৮/০৩/৮৭
	বীরভূম-বিষ্ণুপুর জেলা	২৯/০৩/৮৭-১৯/০৪/৮৭
শেরবোর্ণ	কালেক্টর-বীরভূম-বিষ্ণুপুর জেলা	২৯/০৪/৮৭-অক্টোবর'৮৮
ক্রিষ্টোফার কিটিং	কালেক্টর - বীরভূম-বিষ্ণুপুর জেলা	ডিসেম্বর'৮৮- ৬/৮/৯৩

জঙ্গলমহল জেলার সৃষ্টি : সামরিক শহর থেকে প্রশাসনিক বাঁকুড়া শহরের বিবর্তন, ১৮০৫-১৮৩৩ খ্রীঃ

১৭৯৩ খ্রীঃ ১২জানুয়ারী সরকারী নির্দেশানুযায়ী বিষ্ণুপুর শহর থেকে প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্র বর্ধমানে স্থানান্তরিত হয় এবং বিষ্ণুপুর জেলার (অংশত বর্তমান বাঁকুড়া জেলা) অস্তিত্ব বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় অঙ্গীভূত হয়। ১৮০৫ খ্রীঃ ১৮নং রেগুলেশন অনুসারে পুনরায় জঙ্গলমহল জেলা গঠিত হয় ও বিষ্ণুপুর প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। এই নবগঠিত জেলার আয়তন ছিল ১৯৪০২ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ৩৫৫৭৭২৫, বর্গমাইলে জনসংখ্যা ১২০.৯২। অবশ্য এর আগেই কোম্পানী বর্ধমান প্রশাসনের অধীনে বিষ্ণুপুরে (১৭৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) সি.আর ব্লান্টকে কমিশনার নিযুক্ত করলে বিষ্ণুপুরের প্রশাসনিক গুরুত্ব ফিরে আসে। অন্তবর্তী অর্ধদশক বর্ধমান-বিষ্ণুপুর যুক্ত জেলার কালেক্টর স্যামুয়েল ডেভিস, আর আয়ারল্যান্ড, আর কানিংহাম মূলত এই অংশের রাজস্ব আদায় ও জমিদারি বিবাদ-বিদ্রোহ নিষ্পত্তি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রূপায়নেই ব্যস্ত ছিলেন। এই কালেক্টরদের নাম নিম্নরূপ

কালেক্টরের নাম	সময়কাল	এলাকা
ওসওয়াল্ড	১৭৯৩	বর্ধমান-বিষ্ণুপুর যুক্ত জেলা
স্যামুয়েল ডেভিস	১৭৯৪	বর্ধমান-বিষ্ণুপুর যুক্ত জেলা
আর আয়ারল্যান্ড	১৭৯৭	”
আর কানিংহাম	১৭৯৮	”
ওয়াই বার্গেস	১৭৯৯	”

১৮০৬ খ্রীঃ ১অক্টোবর পারা, জঙ্গল মহল জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮০৯ খ্রীঃ ২৩ জানুয়ারী রাজস্ব আদায় ক্ষমতা বীরভূম কালেক্টর থেকে বর্ধমান কালেক্টরের অধীন বিষ্ণুপুরের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে আসে এবং ১৮০৯ খ্রীঃ ২৭ জানুয়ারী এই জেলাকে বীরভূম ও মেদিনীপুর প্রশাসনের এক্তিয়ার বহির্ভূত করা হয়।

স্থানীয় জমিদার-চূয়ার বিদ্রোহে লাঞ্ছিত মল্লদেশে স্বতন্ত্র জঙ্গলমহল জেলা তৈরী হলে তার সদর শহর বিষ্ণুপুরে থাকে ১৯০৫ খ্রীঃ থেকে ১৮০৭ খ্রীঃ ২৩ মে পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই বর্গী আক্রমণ, চুয়াড় বিদ্রোহ ও পাহাড়িয়া বিদ্রোহ ঠেকাতে বাঁকুড়ায় সেনা ছাউনী (বর্তমান কাছারী চত্বরে) তৈরী হয়েছিল ১৭৬০ খ্রীঃ থেকেই। ফলে বাঁকুড়া ক্যানটনমেন্ট টাউন হিসাবে খ্যতিলাভ করেছিল। ১৭৮৯-৯১ খ্রীঃ রায়পুরের চূয়ার বিদ্রোহ দমনে বাঁকুড়া ক্যানটনমেন্টকে থেকে পাতাকোলাঘাট হয়ে প্রেরিত

সেনাদলের নেতৃত্বে ছিলেন কালেক্টর কিটিং নিজে। ১৭৯৮-৯৯ খ্রীঃ চুয়াড় বিদ্রোহ দমনে এই সেনা শহরের ভূমিকা ছিল। ১৭৬০ খ্রীঃ বর্গী আক্রমন ঠেকাতেও এখানে ছিল সেনা শিবির। বর্তমান পুলিশ লাইনের তৎকালে নাম ছিল ক্যান্টনমেন্ট গ্রাউন্ড। রঘুনাথপুর কাছারী-আদালত জঙ্গল মহলের সদর শহর বিষ্ণুপুরে স্থানান্তরিত করার ভাবনা কোম্পানীর মনে এলে, বিষ্ণুপুর-কমিশনার চার্লস ব্লান্ট ১৮০৬ খ্রীঃ জুলাই মাসে বাঁকুড়া শহরে সদর স্থানান্তরের জন্য কোম্পানীতে জোরালো সুপারিশ করেন। এর কারণ ছিল বাঁকুড়া জেলার মধ্যস্থলে এর অবস্থিতি এবং সড়ক-সংযুক্তির নিরিখে যে কোন স্থানে, বিশেষত বিদ্রোহ কবলিত দঃ পশ্চিম বাঁকুড়া গমনের সুবিধা। ইতিমধ্যেই নীলকর ও সেনা আধিকারিকদের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল বাঁকুড়ায়। এইসব সুবিধাগুলি ব্লান্টের ভাষায় "an object of no inconsiderable importance forwards the establishment of a vigilant and well-conducted police."

জেলা শহরে প্রশাসনিক ভবন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য কোম্পানী ১৮০৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ছাতনা জমিদারের কাছে ২৫০ টাকা মূল্যে ৬৯ বিঘা ৩কাঠা জমি ক্রয় করে। বাঁকুড়ার তৎকালীন তালুকদার অবশ্য এই নির্মান কাজের বিরোধী ছিলেন। তিনি আধিকারিকদের বসতবাড়ি তৈরীর খাজনা পাট্টা দিতে অস্বীকার করেন। কালেক্টর ব্লান্টের মতে এই বিরোধীতা ছিল অমূলক শঙ্কা থেকে, "the vicinity of the station will suppress any illicit ..... exactions of Tollas and various improper practices which ...... have long been carried on at Ban Coorah."

এর পরের ইতিহাস বাঁকুড়া শহরে ক্রমাগত প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে ওঠার এবং তার সঙ্গে আধিকারিক, কেরানী তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের। জঙ্গল মহলের কালেক্টরের নাম ও কার্যকাল নিম্নরূপ ঃ

উইলিয়াম ব্লান্ট	১৮০৫-১০
আলেকজান্ডার ব্রুইস রাসেল টড	১৮১৩
কেলভিন	১৮১৫ - ১৮১৭
ক্যাপ্টেন কেমিন	১৮১৭
কার্ণেল বেল	১৮১৮
এইচ পি. রাসেল	১৮২৯
হ্যালকেট	১৮৩০

বাঁকুড়ায় সদর শহর স্থানান্তরিত হওয়ার পর প্রশাসনিক ইমারতগুলি গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। বিভাগীয় কমিশনারের বিশ্রাম ও কোর্ট অব সার্কিটের বিচারস্থল হিসাবে কালেক্টর ব্লান্ট ১৮০৭ খ্রীঃ কেন্দুয়াডিহিতে সমতল ছাদ বিশিষ্ট ৫৫×১৬ বর্গফুট বারান্দা ও ৮০×৬২ বর্গফুট ঘরের সার্কিট হাউস তৈরী করেন। এছাড়া তিনি মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালওয়ালা দেওয়ানী জেলখানা নির্মাণ করেন, ১২০০০ টাকায় ৫০০ কয়েদির জন্য। (বর্তমান জেলের পূর্বদিকের কনডেমড্ বিল্ডিং স্থলে)। এই বছরেই নির্মিত হয় ৫০×৫০ বর্গফুট সমতল ছাদ বিশিষ্ট জেলা জজের কাছারি ও জেলা রেজিষ্টারের কাছারী। কাছারী দুটির নির্মাণ ব্যয় ছিল ২৫০০টাকা করে। সার্কিট হাউসের উল্টোদিকে ছিল সিপাহীদের সারি সারি তাঁবু যা সিপাহিডাঙ্গা হিসাবে পরিচিত হয়।

১৮০৮ খ্রীঃ সেনা প্রয়োজনে ছাতনা রাজের কাছে চিরকালীন ইজারা হিসাবে ১২৫ বিঘা ১১ কাঠা ১০ ছটাক জমি সংগৃহীত হয়। কালেক্টরেট চত্তরে ১৮০৯ খ্রীঃ ৫০০ কয়েদী, ২০০ সিপাহীর সারা বছরের খোরাকির চাল মজুত রাখার জন্য (৩১৫০ মন ধান রাখার জন্য) ৪টি গোলা তৈরী হয়। তখন চালের দাম ছিল কিলো প্রতি ১ আনা। উল্লেখ্য ১৮০৮ খ্রীঃ ২০ শে নভেম্বর কালেক্টর ব্লান্ট ফোর্ট উইলিয়ামে চিঠি পাঠিয়ে সিপাহী ও কয়েদির অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছিলেন, বাজারে চালের দাম বৃদ্ধির জন্য। খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তাই ধানগোলার প্রয়োজন ছিল। ২০০ জন সিপাহী ও ৫০০ জন কয়েদির জন্য বরাদ্দ ছিল ৩১৫০(১১৭৫ কুঃ) চাল যার তৎকালীন বাজার দর ৩০০০টাঃ (টাকায় ৪২ সের)। মাথাপিছু ২½ সের। এ সময় অর্থ বরাদ্দ মাথাপিছু ২.৫ পয়সা থেকে ৩ পয়সা করা হয়। ওল্ড ক্যান্টনমেন্ট গ্রাউন্ড ১৭৬৬ খ্রীঃ সেনাবাহিনীর কাছ থেকে জেলা কারাধ্যক্ষের হাতে আসে। ১৮১২ খ্রীঃ জেলা আরক্ষাধ্যক্ষের হাতে জমিটি এলে এটি পুলিশ লাইন হিসাবে গড়ে ওঠে। অস্ত্রমজুতের জন্য ১২×১২বর্গ ফুটের একটি অস্ত্রাগার গড়ে তোলা হয় (বর্তমান জিলাস্কুলের ছাত্রাবাস)। ওই বছর ৯৫০০ টাকা খরচে বর্তমান জেলখানার কাছে স্টোররুম, প্রহরীদের বাসস্থান ও দারোগাদের বাসগৃহ নির্মিত হয়। জেলখানা সংস্কার কার্য হয়েছিল ১৮১০ খ্রীঃ কালেক্টর ব্লান্ট কর্তৃক। ১৮১২ ও ১৮১৪ খ্রীঃ সার্জেন লীকের দ্বারা, ১৮১৬ খ্রীঃ তৎকালীন জেলা জজ কর্তৃক।

১৮০৯ খ্রীঃ পুনর্নির্মিত হয় ২৩০০ বর্গফুটের সিভিল জেল ও পাচকদের আবাসন। খরচ হয়েছিল ৯৫০০ টাকা। বর্তমানের জেলা স্কুল ১৮০৯ খ্রীঃ সিপাহি হাসপাতাল হিসাবে গড়ে উঠেছিল ১৫০×৪৬ বর্গফুট সুউচ্চ খিলানের সাহায্যে।

১৮১০ খ্রীঃ কালেক্টর ব্লান্টের কার্যালয়, পুলিশ সুপার কার্যালয়, দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোর্ট হিসাবে ১৩৭৪৮ টাকা ৮ আনা ব্যায়ে দ্বিতল ইমারৎ নির্মিত হয়(বর্তমানের ওল্ড ট্রেজারি বিল্ডিং)।

১৮১৮ খ্রীঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ক্যাপ্টেন কেমিন নির্মাণ করেন (বর্তমান কালেক্টরেটের বিপরীতের মহাফেজখানা) ৪৫০০ টাঃ ব্যায়ে ৬৫×৬০ বর্গফুটের খিলানাকৃতি ছাদের সদর আমীনের কাছারী।

১৮১৯-২০ খ্রীঃ তৎকালীন জেলাশাসক ক্যাপ্টেন বেলের উদ্যোগে অসুস্থ কয়েদিদের জন্য হাসপাতাল ও বিচারাধীন ও শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের জন্য "ফৌজদারী জেল" (মতান্তরে ১৮২৯ খ্রীঃ ২৫২৩৭ টাঃ ৪আনা ৭পাই ব্যায়ে) নির্মিত হয়।

১৮২৯ খ্রীঃ নবকলেবরে ২৫১×৪৫ বর্গফুট ফৌজদারী জেল প্রতিষ্ঠিত হয় কালেক্টর এইচ পি রাসেলের আমলে।

বাঁকুড়া জেলা শহর প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের প্রাণপুরুষ উইলিয়াম ব্লান্ট ও পরবর্তী কালেক্টর কেমিন, বেল, রাসেল জেলা সদর হিসাবে বাঁকুড়া শহরকে পূর্ণতা দেন। তেমনি জেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন অগ্রণী ভূমিকা নেয়। কালেক্টর ব্লান্ট ১৮০৬ খ্রীঃ জুলাই মাসেই মূলত অসুস্থ কয়েদী ও সিপাহীদের চিকিৎসার জন্য মাসিক ২০টাকা বেতনে একজন কবিরাজকে সরকারী চিকিৎসক নিয়োগ করেন। জেলাশাসক ব্লান্ট এই চিকিৎসক সম্পর্কে বলেছিলেন, "in whose skill the natives repose great confidence"। ইতিমধ্যে বাঁকুড়ায় জেলাকেন্দ্র স্থানান্তরিত হওয়ায় জেল-চিকিৎসক নিযুক্ত হন কবিরাজ রামচন্দ্র সেন, ১৮০৮ খ্রীঃ ৭জুলাই। ১৮১৩ খ্রী ২৯ এপ্রিল এইপদে নিযুক্ত হন রামচন্দ্র কবিরাজ। আর ১৮২০ খ্রীঃ ৪ জুলাই নিযুক্ত হন গোবর্ধন কবারাজ। তাদের বেতন ছিল মাসিক দশ টাকা। ১৮১২ খ্রীঃ জেলা চিকিৎসক (সহকারী) ছিলেন ডাঃ টমাস লীক ও ১৮২১খ্রীঃ ১১আগষ্ট এই পদে নিযুক্ত হন ডাঃ জি এন চীক। এই শতকের প্রারম্ভে দেশীয় কয়েদী ও সিপাহীদের এ্যালোপাথী চিকিৎসার প্রতি বিরূপতা ও কবিরাজ-মুখিতা ব্রিটিশ শাসকদের কবিরাজ নিয়োগে বাধ্য করে। এ সময় মফস্বলে কবিরাজি চিকিৎসার চল থাকলেও সরকারী উদ্যোগে জেলাবাসীর জন্য এ্যালোপাথী ও অন্যান্য চিকিৎসা পরিষেবার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছিল বলে মনে হয় না।

জঙ্গলমহল জেলায় সরকারী প্রচেষ্টায় শিক্ষা বিস্তারের কোন তথ্য নেই। ১৮১৭ খ্রীঃ একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিবেদনে জানা যায় জেলায় শিক্ষা সম্পর্কে কোন আগ্রহ বা ধ্যান ছিল না। শহরে খুব কমসংখ্যক মানুষই নাম স্বাক্ষর করতে

জানত। গ্রামাঞ্চল ছিল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। কিছু কিছু স্থানে টোল-পাঠশালা-মোক্তবের অস্তিত্ব থাকলেও তা সামগ্রিক শিক্ষা মানচিত্রের মধ্যে বিন্দুমাত্র। শহরের ব্যবসায়ী পুত্ররা পাঠশালায় গিয়ে হিসাব নিকেশটুকুই শিখত, জমিদার শ্রেণীর সন্তানরা নামমাত্র শিক্ষিত হলেও আমজনতা ছিল শিক্ষায়তনের বাইরে। ১৮৩২ খ্রীঃ ডিরোজিও শিষ্য হরচন্দ্র ঘোষ জঙ্গলমহল জেলায় সদর আমিন হিসাবে যোগ দিয়ে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাক্তিগত উদ্যোগ নেন। জঙ্গলমহলে শিক্ষাবিস্তারের তা প্রথম প্রয়াস বলে মনে হয়। হরচন্দ্র নিজ অর্থে বর্তমান জিলা স্কুল ভবনে (তৎকালীন পরিত্যক্ত সিপাহী হাসপাতাল) অবৈতনিক আধুনিক শিক্ষার স্কুল শুরু করেন। ১৮/০৭/১৮৩৮ তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন "তাদের অধিবাসীদের মধ্যে উন্নতি করার প্রচেষ্টা এখনো পর্যন্ত দেখা দেয়নি। কয়েকজন হিতৈষী ভদ্রলোকের সহায়তায় সম্প্রতি একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু সাহায্যের অভাবে এই একমাত্র ধরণের বিদ্যালয়টি অসার্থক হয়ে গেছে। এক যাজক ভদ্রমহোদয়ের আনুকূল্যে স্থাপিত দু-তিনটি মাতৃভাষার মিশনারী বিদ্যালয়ের অবস্থাও তদ্রুপ।"

১৮২৫ খ্রীঃ দশের বাঁধের সীতানাথ চক্রবর্তীর পাঠশালায় বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯০ খ্রীঃ বিদ্যালয়টি বাঁকুড়া সরাইখানায় স্থানান্তরিত হয়। উল্লেখ্য সরাইখানাটি আডডা, রামসাগর ও জয়পুরের সাথে বাঁকুড়াতে ১৮০৮ খ্রীঃ ২বিঘা ১৬ কাঠা ১০ ছটাক জমিতে ২৫০×৩৩ বর্গফুটের ইমারৎ হিসাবে নির্মিত হয়েছিল।

১৮০৫ খ্রীঃ বাঁকুড়ায় কালেক্টরেট স্থাপনের সাথে বেশকিছু কর্মচারী নিয়োগের ঘটনা ঘটে। তখন বাঁকুড়ায় ইংরাজী শিক্ষার চল না থাকায় স্বভাবতই স্থানীয় কর্মচারীকূল ছিল বাংলা-সংস্কৃত-ফার্সী ভাষায় শিক্ষিত স্থানীয় বা বহিরাগত। নিম্ন তালিকা থেকেই তা অনুমান করা যাবে।

পদ	নাম	নিবাস	নিয়োগ তাং	বেতন
ইংলিশ অফিস কেরানী	তারিণী চরণ মুখার্জী	১(আদি)খামারগাছি, হুগলী ২ ময়নাপুর, কাজী মহল্লা	১৮০৬, ৮মে	১০০টাঃ
ফার্সি-বাংলা মোহরী	মনসারাম মিত্র	হাটতলা	১৮০৭, ১৮ জুলাই	১৫টাঃ
নায়েব নাজির	লালা ভবানী সিং	হদগামহল্লা	১৮০৮, ২৮ এপ্রিল	১৫টাঃ
রেকর্ড কিপার	রামমোহন মজুমদার	গোপীনাথপুর	১৮০৮, ১ জুন	৩০টাঃ
নায়েব সেরাস্তাদার	মীর সুজাউতআলী	ইদগা মহল্লা	১৮১০, ১৭ আগষ্ট	১০০টাঃ
ডিক্রী নৌজি	মৌলবী রাসের বক্স	কাজী মহল্লা	১৮১১, ২৮ ফেব্রুয়ারী	২০টাঃ
নাজির	লালা মূলচাঁদ	ইদগা মহল্লা	১৮১১, ২৮ ফেব্রুয়ারী	২৫টাঃ
সরকারী উকিল	গুরুপ্রসাদ মুখার্জী	হাটতলা (সোমসার)	১৮১১, ২৮ ফেব্রুয়ারী	২০টাঃ
পেশকার	মথুরনাথ মিশ্র	হাটতলা (সোমসার)	১৮১১, ২৫ জুন	৬০টাঃ
সেরেস্তাদার	মীর আবুল হোসেন	ইদগা মহল্লা	১৮১২, ৯ সেপ্টেম্বব	৬০টাঃ

১৮০৬-১৮১৩ এই সময়কালে এই ধরণের প্রায় ১২৫ জন সরকারী কর্মচারী বাঁকুড়ায় বাস করতে থাকেন। এমন এক সরকারী কর্মচারী অধ্যুষিত মহল্লা ছিল কেরাণীবাজার। হরচন্দ্রের বিবরণ অনুসারে কালেক্টরেট পর্যন্ত শালকিয়া রোডের দুপাশে ছিল সারিবদ্ধ দোকান, যার ছাউনী ছিল খড়ের। শহরের ১৪টি মহল্লার চৌকিদার ছিল ৩০ জন। ১০ জন ৩টাকা মাসিক বেতনে কালেক্টর দ্বারা নিযুক্ত ও ২০ জন জয়বেলিয়া ঘাটোয়ালের অধীনস্থ।

শতাব্দীর শুরুতে নব বাঁকুড়ার পত্তনের সাথে সাথে বিরাজমান অপরাধিত্ব ছিল ব্রিটিশ শাসকদের উদ্বেগের জায়গা। ১৮০৮ সালে ফৌজদারী মামলার সংখ্যা ছিল ৫৪। মোট গ্রেপ্তার ২০০। অভিযুক্ত ২৩৩। ১৮২৩ সাল পর্যন্ত গড় পড়তা অপরাধ ছিল ৫০০ জন সংখ্যায় ১টি। খুনের ঘটনা গড়ে ৩০টি। ১৮২৬ খ্রীঃ অপরাধের ঘটনা বাড়ে ৫০ শতাংশ। ১৮২৩ খ্রীঃ থেকে ১৮২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত অপরাধের বার্ষিক গড় ছিল ২০০০ এর বেশী। গড় জাড়িত মানুষ ৪০০০।

নতুন বাঁকুড়ার গঠনকার্যে দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের ভূমিকা, নিযুক্ত অন্যান্য শ্রমিকদের চেয়ে কম কিছু ছিল না। বনবাঁকুড়াকে জেলা শহরে পরিণত করার জন্য ব্লান্ট কোম্পানীকে লিখেছিলেন "The work of clearing the jungle alone around the station would afford ample and useful employment to any number of convicts." কালেক্টর ও কাছারি চত্তর নির্মাণেই জড়িত ছিল ১০০ জন কয়েদী। সিংভূমের পাতকুস জঙ্গলের দুর্ধর্ষ ২০ জন উপজাতিকে আনিয়ে ব্লান্ট সাহেব তাদের প্রহরায় কয়েদীদের বাঁকুড়া-সোনামুখী ও বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর রাস্তা-সেঁতু নির্মানে নিয়োগ করেন। প্রহরীদের মাথাপিছু খরচ ছিল ১.৫ টাকা। রাস্তার নির্মান কাজ হয়েছিল ১৮১৯ খ্রীঃ মে পর্যন্ত। ১৯২১ খ্রীঃ পুরস্কার বাবদ ৩টাঃ, সরকারী ভবন সংস্কার বাবদ ১৭ টা ৮ আঃ, রাস্তা সারাই বাবদ ৪২৫ টা ৪আঃ ৩ পাঃ, বিবিধ হিসাবে ১৮৩ টাঃ ৫ আ ৬পাই খরচ হয়েছিল মুলত কয়েদীদের শ্রম-মজুরি বাবদ। ১৮৬০ সনে জেল সম্মুখস্ত পানীয় জলের পুকুরের খননে নিযুক্ত হয়েছিল ১৪০ জন কয়েদী। এই সময়ে দণ্ডিত অপরাধীদের মধ্যে ছিল ব্রজরাজ সিং, দখিনী সহাই (যাবজ্জীবন), বলাই মুচি, পাচু ভূমিজ (যাবজ্জীবন) শালাগী মাহাত, পচাই রায় ইত্যাদি। পানীয় জলের জন্য কুয়ো তৈরী করা হয়েছিল বাঁকুড়া শহর ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে। গভর্নর কারমাইকেল পরবর্তীকালে শহরে একটি বড় বাঁধ (জলাশয়) খনন কাজের সূচনা করেছিলেন।

জঙ্গলমহল জেলায় মল্লরাজবংশের নেতৃত্বে চুয়াড় বিদ্রোহ : বাঁকুড়া কালেক্টরেট আক্রমণ

১৮০৬ খ্রীঃ কার্তিক মাসে বর্ধমানরাজ বিষ্ণুপুর জমিদারি ক্রয় করলেও তাঁর শাসনের প্রারম্ভিক সময় ছিল চূয়াড় বিদ্রোহের অভিঘাত লাঞ্ছিত। বর্ধমান রাজের উপলব্ধি ছিল, মল্লরাজবংশের অনুগত কর্মচারী ভূস্বামীদের উচ্ছেদ ও সেনাপত-চাকরান ইত্যাদি সম্পত্তিতে রাজস্ব আদায় না করলে তাঁর জমিদারি নিষ্কন্টক ও সংহত করা যাবে না। তিনি এজন্য পত্তনি প্রথা চালু করেন। মল্লরাজবংশের বক্তব্য ছিল জমিদারি হস্তান্তরের সময় এই শ্রেণীর জমিগুলো হস্তান্তর প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল। এমনকি অধিগৃহীত জমির বিনিময়ে কোম্পানী কতৃক ভরণ-পোষণ বৃত্তির অধিকারী হয়েছিলেন তাঁরা। এ সময় তাঁদের ভরণ পোষণ ভাতা ছিল ১০২৫০ টাকা।

মল্লরাজবংশের প্ররোচনায় এ সময় দুটি বড় বিদ্রোহ ঘটে। ১৮০৮ খ্রীঃ ২৯ ফেব্রুয়ারী রামকড়ি ঘোষ, নামকড়ি হাজরা, নওসিং হাজরারা, পাত্রসায়র, বলরামপুর, মনসুরপুর, বাডডা, হমিরপুরের হাজার খানেক চুয়ারকে নিয়ে পাত্রসায়র কাছারি আক্রমণ করে ও বর্ধমানরাজানুগত জমিদার খোশল সিং ও আর দুজনকে মারাত্মক জখম করে। সেজোয়াল কোম্পানীর কুঠিতে গাঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষা করেন। তবে এ বিদ্রোহের ব্যাপকতা নিয়ে দ্বিমত আছে। এ সময় বর্ধমান রাজের ধার্য্য করের চেয়ে ৮০০০০ টাঃ কম আদায় হয়। নিমাই সিংহ, গৌরমোহন সিংহ, ক্ষেত্রমোহন সিংহদের বাধাদান এর অন্যতম কারণ।

মল্লরাজ মাধব সিংহের ওন্দাথানা এলাকায় চুয়াড়দের সংগঠিত করার কথা ইতিমধ্যে বিবৃত হয়েছে। ১৮০৮ খ্রীঃ প্রথমার্ধে তিনি চুয়াড়দের নিয়ে বাঁকুড়া কালেক্টরেট দখলের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অভিযান করেন। এই অভিযানে যোগ দিতে আসা বর্গেতের সর্দারদের ধলভূম সীমান্তেই পরাস্ত ও গ্রেপ্তার করা হয়। মাধব সিংহ ও তার সহচরদেরও পরাস্ত ও গ্রেপ্তার করা হয়। এসময় কালেক্টর ছিলেন উইলিয়াম ব্লান্ট। মাধবসিংহের পরিবারকে চুঁচুড়ার সন্নিকটে ১০০০ টাকা মূল্যে নির্মিত নেটিভ গৃহে গৃহবন্দী করা হয় (সূত্রঃ ১৮০৮ খ্রীঃ ৯ মার্চের কালেক্টরের কোম্পানীর নিকট পত্র)। মাসোহারা ধার্য্য হয় ৪০০ টাকা। প্রদীপ চিরনির্বাপনের আগে শেষ জ্বলে ওঠার নিষ্ফল এই প্রয়াসের খেসারত হিসাবে এই পরিবার চরম দারিদ্রে পতিত হয়। বিষ্ণুপুরে কোনদিন ফিরলে রাজাকে মাসিক ভাতা বন্ধের অপমানজনক শর্তও দেওয়া হয়। ছেলের শ্রাদ্ধের টাকা সংগ্রহে অপারগ রাজমাতাকে কোম্পানীর কাছে অর্থ সাহায্য

চাইতে হয়। পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভাতা বৃদ্ধির রাজমাতার আবেদনের তদন্তে কালেক্টর ব্লান্টের সুপারিশ ছিল রাজমাতার নিজের ও মাধব সিংহের চারপুত্রের জন্য ২০০ টা, মাধবপত্নী ধ্বজামনির জন্য ২০ টাকা, পরিবারের অন্য ছয় জনের (প্রহ্লাদ, প্রতাপ, স্বরূপ, চন্দ্র, কিসোরী, দুলাল) ১২ টাকা করে ৭২ টাকা মোট ২৯২ টাকা। অথচ এই রাজবংশের যখন পত্তন হয়েছিল তখন ইংরেজের খ্রীষ্টধর্ম বা নবাব-বাদশাহ অনুসৃত ইসলাম মতবাদী ভারতে একজনও ছিলেন না।

জঙ্গলমহলের অপরাধতত্ত্ব

মল্লরাজ শাসনের ঘাটোয়াল, সীমান্দার, তালুকদারদের অনেকেই নবপ্রবর্তিত ইংরাজ শাসনে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ায় ডাকাতি সহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। কালেক্টর ব্লান্টের একটি রিপোর্টে জানা যায় বাঁকুড়ার এক তালুকদার ছিলেন অনেক সংঘটিত ডাকাতির মূল নায়ক। অপরাধিত্বের নিয়ন্ত্রণ ছিল ব্রিটিশ শাসকদের কাছে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। ১৮০৮ খ্রীঃ কোর্ট অব সার্কিটে ফৌজদারি মামলা ছিল ৫৪। মামলাগুলিতে অপরাধীর সংখ্যা ২৩৩, গ্রেপ্তার ২০৭। এদের মধ্যে ৫০ জন ছিল ব্যর্থ কালেক্টরেটআক্রমণের বিদ্রোহী। অপরাধের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে দেখা যায় ১৮২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত অপরাধ প্রবণতা বেড়ে চলেছিল। এমনকি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৮২৬ খ্রীঃ অপরাধ প্রবণতা ছিল প্রায় ৫০% বেশী। তবে পরবর্তী এক দশকে জঙ্গল মহল জেলায় অপরাধের ঘটনা ১০ ভাগ হ্রাস পায়। ১৮২৩-২৬ খ্রীঃ অপরাধপ্রবণ সময়ে দন্ডাজ্ঞার হার ছিল ৩৫.৫%।

জঙ্গলমহলে সতীদাহ

১৮২৮ খ্রীঃ সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত জঙ্গলমহল জেলায় সতীদাহের ঘটনা ছিল উল্লেখযোগ্য। কালেক্টর কেলভিনের হিসাবমত এই জেলার সতী সংখ্যা ছিল ১৮১৫ খ্রীঃ ৩১, ১৮১৬ খ্রীঃ ৩৯, ১৮১৭ খ্রীঃ ৪৩, ১৮১৮ খ্রীঃ ৬২। এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতার জন্য অংশত সরকারী নীতিকে কেলভিন দায়ী করেন। তাঁর মতে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সতীদাহের অনুমোদনের প্রক্রিয়া পরোক্ষে স্বার্থান্বেষী শ্রেণী কর্তৃক সতীদাহ প্ররোচনায় উৎসাহ বর্ধন করেছিল। তিনি মনে করতেন অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এই প্রবণতা বেশী। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন নিষিদ্ধকরণের মত আইন এক্ষেত্রে প্রণয়ন করলে এই কুপ্রথা কোন বিরোধিতা ছাড়াই রোখা সম্ভব বলে তাঁর ধারণা ছিল। ১৮২২, ১৮২৩, ১৮২৪, ১৮২৫, ১৮২৬ খ্রীঃ জঙ্গল মহলে

সতীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৪, ২৭, ১৬, ৯, ১১ টি। ১৮২২ খ্রীঃ ২৪ মে ২৫৭ নং বিজ্ঞপ্তিতে সদর নিজামৎ আদালত জেলা শাসকদের নির্দেশ দেয় যাতে প্রত্যেক সতীদাহের ঘটনায় সতীদের ও তার স্বামী-সন্তানদের তথ্য ও উপস্থিত পুলিশ অফিসারের তথ্য সংগৃহীত হয়। এই সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় সতীদের প্রায় সবাই নিম্নবর্ণীয়। বেশীরভাগই পঞ্চাশোর্ধ। কোন কোন ক্ষেত্রে সতীদাহে সরকারী বাধার কথা জানা যায়। ১৮২৪ খ্রীঃ একটি সতীদাহের ক্ষেত্রে মৃতের দেড় বছরের শিশু সন্তান থাকা সত্ত্বেও পুলিশি আপত্তি আগ্রাহ্য করে সতীদাহ হয়। দায়ী নিকটাত্মীয়ের ২০০ টাকা করে জরিমানা ধার্য্য হয়। অনাদায়ে ৩ মাস জেল ঘোষিত হয়। জেলাশাসকের এই দন্ডাদেশ কোর্ট অব সারকিটও অনুমোদন করে। ১৮২৬ খ্রীঃ একটি সতীদাহের ঘটনায় (পুলিশি উপস্থিতি সত্ত্বেও) ক্ষুব্ধ আদালত জেলাশাসককে তদন্তের নির্দেশ দেয়। কেলভিন ব্যাক্তিগতভাবে সতীদাহে উদ্যোগী পক্ষকে বুঝিয়ে সতীদাহ থেকে বিরত করার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ পুলিশি তৎপরতায় দুটি সতীদাহ বন্ধ করা গিয়েছিল। অবশেষে ১৮২৮ খ্রীঃ সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ায় জেলায় সতীদাহের ঘটনা অন্তর্হিত হয়, কিছু গুপ্ত উদ্যোগ ছাড়া।

জঙ্গলমহল জেলার প্রশাসনিক কাঠামো ও ব্যয় ঃ আইন শৃঙ্খলা

১৮১৩ খ্রীঃ জঙ্গলমহলের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার রাসেল বুয়ের টডের বেতন ছিল ২৩৩৩ টাকা। তাঁর অধীনস্ত রেজিস্ট্রার থমাস পখেহামের বেতন ছিল ৫০০ টাকা। সহকারী চিকিৎসকের বেতন ৩০০ টাকা। বাঁকুড়া, বর্ধমান থেকে আগত ৭টি থানা, মেদিনীপুর থেকে আগত ছাতনা, বড়সারেঙ্গা থানার পুলিশ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার খরচ ছিল বাৎসরিক ৭৩৪৭ টাঃ। বিষ্ণুপুর রাজবংশের রাহাখরচ ১১১৬০ টাকা, পাঞ্চেতের ১৯ জমিদারের নিরাপত্তা প্রদানের পরিবর্তে দেয় ৪৭৬ টাঃ। অন্যান্য কর্মচারী ও তাদের বেতন ইতিমধ্যেই বিবৃত হয়েছে। ১৮২১ খ্রীঃ ১১ আগষ্ট নিযুক্ত জেলার সহকারী সিভিল সার্জেন জি এন চীকের বেতন ছিল মাসিক ৩০০ টাকা। ১৮৩২ খ্রীঃ নিযুক্ত সদর আমিন (মুন্সেফ) হরচন্দ্র ঘোষের বেতন ছিল ১০০ টাকা মাসিক ১৮০৭ খ্রীঃ নিযুক্ত জেলর জব্বুর বেতন ছিল মাসিক ১৫ টাকা।

কালেক্টর কর্তৃক আদায়ীকৃত রাজস্বের বৃহদাংশ কোম্পানী তাদের বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য খরচ করত। এসময় এই উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ায় নিযুক্ত কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জন চীপের বেতন ছিল ২৪৯৩ টাকা (১৭৯৭ খ্রীঃ যার বেতন ছিল ৫০০ টাকা, ঘরভাড়া ভাতা সহ)। তাঁর বীরভূমের অফিস-বাংলোর সাথে কিটিং-এর

বাংলোর তুলনা ও পতিপত্তির ফারাক ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে।

জেলার এসময়ের আইন শৃঙ্খলা ও বিচার বিষয়ে তৎকালীন এক প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল, "The name of the district implies a waste territory in a backward stage of civilization, yet it appears from the report of the circuit judge in 1815 that no instance of gang robbery had occurred during the six previous months."

গঙ্গানারায়নী হামলা ঃ জঙ্গলমহল জেলার বিলোপ – সামরিক শাসন, বাঁকুড়া শহরের বিভাজন

১৮৩২ খ্রীঃ বরাভূম রাজপরিবারের সদস্য গঙ্গানারায়ণ, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আদালতের রায় বিপক্ষে যাওয়ায় এলাকার সর্দার, ভূস্বামী, চূয়ারদের সংগঠিত করে জেলায় ব্যাপক হাঙ্গামা তৈরী করেন। বিদ্রোহীরা পরিবারের ক্ষমতাসীন অংশের অনেককে আহত ও নিহত করেন ও ব্যাপক লুঠতরাজে অংশ নেন। এই বিদ্রোহের চাপে পুলিশ ও রাজকর্মচারীরা বর্ধমানে পালিয়ে আসেন। কোম্পানী এক বিশাল সেনা সেখানে পাঠালে গঙ্গানারায়ণ সিংভূমের দিকে পাহাড়ী অরণ্যে পালিয়ে যান ও পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরেই কোম্পানী জঙ্গলমহল জেলার বিলোপ ঘটান। সেনাপাহাড়ী, শেরগড়, বিষ্ণুপুরকে বর্ধমান কালেক্টরীর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। জঙ্গল মহলের অবশিষ্টাংশ ও মেদিনীপুর থেকে বিচ্ছিন্ন ধলভূম এষ্টেট নিয়ে গঠিত হয় মানভূম যা সাউথ ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে একজন সামরিক শাসকের নের্তৃত্বে আসে। এর সদর দপ্তর ছিল বাঁকুড়া।

বর্ধমানভূক্ত অংশ ১৮৩৫-৩৬ খ্রীঃ স্বতন্ত্র পশ্চিম বর্ধমান নামক জেলায় রূপান্তরিত হয় যার সদর দপ্তরও ছিল বাঁকুড়া। ১৮৩৪ খ্রীঃ ৭ জুলাই এর কোম্পানীর নির্দেশ বলে এই অংশের দায়িত্বে ছিল এক জন জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর এবং ১৮৩৭ খ্রীঃ ৩ জুলাইয়ের নির্দেশে বর্ধমান থেকে একে স্বতন্ত্র করা হয়।

এই একই সময়ে দুই জেলার সদর শহর বাঁকুড়া হওয়ায়, বাঁকুড়া শহরের কার্যত প্রশাসনিক বিভাজন ঘটে। ছাতনা-সুপুর-অম্বিকানগর 'এজেন্সীর' অধীনস্ত ছিল। কালিতলা থেকে মাচানতলা হয়ে জেলা গ্রন্থাগার সন্মুখস্ত জেলখানামুখী বর্তমান সড়ক এই দুই জেলা প্রশাসনের অস্পষ্ট বিভাজনরেখা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। পশ্চিম বর্ধমানের কালেক্টর থাকতেন বর্তমান জেলাজজের আবাস কেন্দুয়াডিহি ভবনে। এর দুশ গজের মধ্যেই থাকতেন 'ফ্রন্টিয়ার এজেন্সির' সামরিক শাসক

(এজেন্ট) কাপ্টেন উইকিলসন ও পরবর্তীকালে হ্যারিংটন। এই দুই প্রশাসনিক বিভাগের আধিকারিকদের নাম নিম্নরূপ।

সাউথ ওয়েষ্ট এজেন্সী

সময়	শাসক	পদ নাম
১৮৩৩	উইকিলসন	প্রিন্সিপাল এ্যাসিস্ট্যান্ট টু.
১৮৩৬	হ্যরিংটন	টি এজেন্ট অব গভর্ণর

পশ্চিম বর্ধমান জেলা

সময়	শাসক	পদ নাম
১৮৩৬	ডব্লু এইচ এলিয়ট	কালেক্টর
১৮৪০	জে এইচ গ্রাহাম (যুগ্ম)	”
১৮৪৬	জর্জ লচ	”
১৮৫০	জে. বি. ম্যাকটিয়ের	”
১৮৫৪-৫৬	(স্প্যাঙ্কল), জে.ই. গ্যাসট্রেল	”
১৮৫৬	এইচ রোজ	”
১৮৫৯	জে সি গ্রান্ট	”
১৮৬০	(এইচ রিচার্ডসন), ই ড্রুমন্ড	”
১৮৬৬	ডব্লু এস ওয়েলস (ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট)	”
১৮৭৩	কেরলস্করি	”
১৮৭৮	আর এম ওয়ালার	”

জঙ্গলমহলে মোকদ্দমার হাল হকিকত

১৮৬৪ খ্রীঃ মামলা দায়ের হয়েছিল ৪৪৮৯ টি যার মধ্যে ৪৪৮২ টির মীমাংসা হয়েছিল অথচ ১৮৮৭-৯৩ সনের মধ্যে দায়ের করা মামলা ছিল ১১২ (বছরে ১৮টি) ও নিষ্পত্তি হয়েছিল ৬৯ টি। কর্ণওয়ালিশ কোড চালু হওয়ার পর বিচার চিত্রের হালহকিকত এর থেকে অনেকটাই বোঝা যায়।

পশ্চিম বর্ধমান (বাঁকুড়া) জেলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, শিক্ষার উন্মেষ (১৮৩৩-১৮৮১ খ্রীঃ) নীলবিদ্রোহ, প্রতাপ হাঙ্গামা, মিশনারী বিরোধী দাঙ্গা

জঙ্গলমহল জেলায় (১৮০৫-১৮৩৩) শিক্ষা ছিল “very little attended to” এবং ভূস্বামী-বণিকবংশের ফার্সী-সংস্কৃতে কাজ চালানো শিক্ষাগ্রহণ (untill

they understand common accounts) ছাড়া তৎকালে শিক্ষার কোন বিস্তার ছিল না (সূত্রঃ তৎকালীন ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিবেদন)। ১৮০৫ খ্রীঃ জেলাশহর হিসাবে বাঁকুড়া শহর প্রতিষ্ঠিত হলেও আধিকারিক, কর্মীরা অধিকাংশই ছিলেন বহিরাগত। স্থানীয় নিযুক্ত কর্মীরাও ছিলেন ফার্সী-সংস্কৃতে স্বল্পশিক্ষিত। ইংরেজী শিক্ষা ছিল তখনও অপ্রচলিত।

মোক্তব-টোল-চতুষ্পদীর পাশাপাশি ইংরাজী বাংলা শিক্ষার প্রচলন মূলত পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শুরু হয়। দশের বাঁধের সতীনাথ চক্রবর্তীর পাঠশালা ১৮৩৩ খ্রীঃ মধ্য বাংলা বিদ্যালয়ে (বঙ্গ বিদ্যালয়) উন্নীত হয় ও ১৮৯০ খ্রীঃ এটি শহরের কেন্দ্রস্থলে মুশাফিরখানায় স্থানান্তরিত হয়। এই মুশাফিরখানায় ১৮৬৭ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' বা 'মডেল গার্লস স্কুল' স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করে। বস্তুত ১৯৩৩ খ্রীঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ সরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগের শর্ত হিসাবে ইংরাজী আবশ্যিক করলে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার দ্রুততর হয়।

লর্ড বেন্টিং হরচন্দ্র ঘোষকে বাঁকুড়া আদালতের মুন্সেফ (১৮৩২-৩৮খ্রী) নিয়োগ করলে, ডিরোজিওর এই শিষ্য বাঁকুড়ায় আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে উল্লেখ্যযাগ্য ভূমিকা নেন। তিনিই প্রথম নিজ উদ্যোগে একটি অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার আলোকবর্তিকা প্রজ্বলন করলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল সাধারণ মানুষ যত শিক্ষিত হবে শাসক-শাসিতের টানাপোড়েন তত হ্রাস পাবে। হরচন্দ্রের বিদ্যালয় ছিল সম্ভবত বর্তমান জিলাস্কুলে (তৎকালীন পরিত্যক্ত সিপাহী হাঁসপাতালে) গণউদ্যোগে এবং জেলা জজ গোল্ডাসবেরী, চার্চ-মিশন সোসাইটির রেভারেন্ড ওয়েইটব্রেক্ট ও সার্জেন জি এন চীকের নেতৃত্বে অবৈতনিক বাঁকুড়া ফ্রি স্কুল (পরবর্তীকালে জেলা স্কুল) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আধুনিক শিক্ষার এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। তবে জেলাশাসক ব্যারোর (১৮৯১-৯৩) মতে শিক্ষা তখনও পর্যন্ত ছিল উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ১৮৯০ খ্রীঃ বঙ্গ বিদ্যালয়কে মুশাফিরখানার লিজ ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কালেক্টর যেমন মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, তেমনই ১৮৪৬ খ্রীঃ কালেক্টর জর্জ লচ নিজেই জিলা স্কুলে প্রত্যেকদিন ১ ঘন্টা করে ক্লাস নিতেন।

এরপর ওয়েসলিয়ান মেথডিক্ট মিশনের মত খ্রীষ্টান মিশনারীরা বাঁকুড়ায় শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ১৮৯৪ খ্রীঃ ডি. বরাটের উদ্যোগে দোলতলায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু স্কুল। ১৮৭০ খ্রীঃ বাঁকুড়া শহরের কুচকুচিয়া পল্লীর রেভঃ জে আর ব্রডহেড, বিষ্ণুপুরে ওয়েসলিয়ান মিডল ইংলিশ স্কুল ও বাঁকুড়া মিশনের সদর দপ্তরে ফিমেল ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ বিষ্ণুপুরে সাঁওতালদের বোর্ডিং স্কুল

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসময়ে বাঁকুড়ায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রভাব বাড়ে ও শিক্ষা সার্বজনীন রূপ নিতে শুরু করে। ইতিমধ্যে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, ওন্দা, মেজিয়া, ছাতনা, সারেঙ্গা, আদ্রা, খায়েরপাহাড়ী, গোবিন্দপুর, চেলিজামি, কুচিয়াঘাঁটি ইত্যাদি স্থানে মিশন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বাঁকুড়ায় ৩টি, বিষ্ণুপুরে ৫টি, ওন্দায় ১টি বালিকা বিদ্যালয় চালু হয় মিশনারী আনুকূল্যে। ১৮৮১ খ্রী স্কুলপড়ুয়া বালিকার সংখ্যা ছিল ৫০৭ যা ১৮৯১ খ্রীঃ দাঁড়িয়েছিল ৮১৬ তে। ১৮৮১ খ্রীঃ সাক্ষর মহিলা ছিলেন ৪০৯ জন। ১৯৩৫-৩৬ খ্রীঃ জেলাশাসক এফ জি হার্ট ও জজ মহাতব ভট্টাচার্যের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইদগামহল্লায় হরিজনদের জন্য অবৈতনিক প্রাঃ বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন জেলাশাসক জে এম চ্যাটার্জী (১৯৩৫-৩৭ খ্রীঃ)। উচ্চশিক্ষা সূচনার প্রয়াস হিসাবে ১৯০৩ খ্রীঃ ২৫ জুন সেন্টার হলে (বর্তমান বি.ডি.সি.সি.ব্যাঙ্ক) কালেক্টর জ্ঞানেন্দ্রগুপ্তের সভাপতিত্বে এক মহতীসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৯ জুন ২১ জন ছাত্র নিয়ে ওয়েসলিয়ান কলেজ শুরু হয়। ১৯০৬ খ্রীঃ ১৬ জুলাই গভর্নর হেয়ার কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কলেজের অধ্যক্ষরা ছিলেন জন মিচেল (১৯০৩-১৭), আর্থার ব্রাউন (১৯১৭-৩৮), সিএফ বল (১৯৩৮-৪৭)। গভর্ণর এ্যান্ডু ফ্লেজার জেলা জজ আবাস হিল হাউস অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তদন্তে বাঁকুড়ায় ১৯০৪খ্রীঃ ২৭ আগষ্ট এলে ৫৬০ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত গণদরখাস্তে গভর্ণরের কাছে কলেজের দাবী জানান হয় (উল্লেখ্য অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে কেন্দুয়াডি কালেক্টর-বাংলো থেকে কালেক্টর হিল হাউসে ও জজসাহেব কেন্দুয়াডিতে থাকতে শুরু করেন ২০০৩-০৪ সনে)। গণদরখাস্ত সম্পর্কে রেভঃ স্মিথ কালেক্টরকে লিখেছিলেন "the godwill of the town & Dist of Bankura... to establish a college." ১৯২৮ খ্রীঃ গভর্ণর রোনাল্ডসে কলেজের ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি পুরভবনেরও সূচনা করেন।

শিক্ষার বিস্তার ও প্রশাসনিক সংস্কারের সাথে ভূমিজ বিদ্রোহের আঁচ ক্রমশ কমতে থাকে। ১৮৩৬ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর নামে এক ব্যক্তি নিজেকে বর্ধমানরাজ প্রতাপ (তিনি জাল প্রতাপ নামে নিন্দিত) হিসাবে দাবী করেন এবং বাঁকুড়ায় নিজ দাবীর সমর্থনে শক্তি সংহত ও প্রদর্শন করতে ৪০০-৫০০ সশস্ত্র অনুচর নিয়ে বাঁকুড়া শহরে শোভাযাত্রা করেন। এদের বেশীরভাগই ছিলেন সুবিধাপ্রত্যাশী কায়স্থ ও অন্যান্য আর্থিকভাবে বলিষ্ঠ শ্রেণীর। কিছু ছিল উত্তর ভারতীয় বরকন্দাজ, কিছু মানভূমীয় লড়াকু। ঢাল তলোয়ার, লাঠি, তীর-ধনুক ছাড়া কিছু কামানও ছিল এদের হাতে। ক্ষেত্রমোহনের মত মল্লবংশীয় ভুস্বামী এদের সমর্থনে

দাঁড়ান। জেলাশাসক ডব্লু এইচ এলিয়টের মতে এই অভিযানে মল্লরাজদের সমর্থনের কারণ ছিল জমিদারি ফিরে পাওয়ার আশ্বাস। জেলা প্রশাসন অভিযানকারীদের গ্রেপ্তার ও দমন করে।

নীল বিদ্রোহের ঢেউ দেশের বিভিন্ন অংশ অশান্ত করে তুললেও বাঁকুড়া ছিল আপাত শান্ত। এর কারণ ছিল বাঁকুড়ার নীলকরদের আপাত জনহিতকর ভূমিকা ও জেলাশাসকদের নীল কৃষক দরদী ভূমিকা। ১৮৬৩ খ্রীঃ কালেক্টর গ্যাসট্রেলের প্রতিবেদনে দেখা যায় এ জেলায় দুটি মুখ্য নীলচাষ কেন্দ্র ছিল। একটি ছিল সোনামুখী কেন্দ্রিক এবং জে. এরাস্কিনের মালিকানাধীন। অন্যটি ছিল বাঁকুড়া শহরের ডাঃ জি এন চীকের অধীনে। ডাঃ চীক জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে এবং চারদশক জেলার স্বাস্থ্যকর্তা হিসাবে জেলার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন দিশা দিয়েছিলেন। এরস্কিন ছিলেন 'মহমতি' চীপের উত্তরসূরী। এই চীপের জনপ্রিয়তা এমন ছিল যে বিবাদী পক্ষগুলি কালেক্টরের কাছে না গিয়ে চীপের কাছে সালিশির জন্য হাজির হতেন। যদিও স্কেলের মত দু-একজন নীলকর গিসবর্ন কোম্পানী অনুসৃত শ্রমের জন্য সঠিক মজুরি নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে রায়ত ও নীল শ্রমিকদের শোষণ করত। তবে কালেক্টরের ভূমিকা রায়ত অনুকূল হওয়ায় এ জেলায় নীল বিদ্রোহ দানা বাঁধেনি। ১৮৩৮ খ্রীঃ কালেক্টর এইচ. সি. হ্যালকেট নীলকরদের পুলিশদের সাহায্যকারী হিসাবে নিয়োগের সিদ্ধান্তকে 'pernicious' ও 'ruinous' বলে অভিহিত করেন, কারণ তাঁর মতে এই 'mischievous, violent or prejudiced' নীলকরদের পুলিশ সহযোগী ভূমিকা নিলে তা জনহিতের পরিবর্তে ব্যাক্তি স্বার্থ পূরণের কাজে লাগবে।

১৮৪০ খ্রীঃ ডিসেম্বরে কালেক্টর জে এইচ গ্রাহামের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ফসল-গাছ নষ্টকারী পশুদের খোঁয়ারে রাখার প্রস্তাবের সঙ্গত সমর্থনকারী ছিল নীলকরেরা। ধৃত পশুমুক্তির হার ছিল মোষ-ঘোড়া আট আনা, গরু বলদ পিছু চার আনা, বাছুর-ছাগল ভেড়া-শূকর পিছু দু-আনা ও পশুখাদ্যের খরচ।

১৮৫০ খ্রীঃ জেলাশাসক জে বি ম্যাকটিয়েরের প্রতিবেদনে জানা যায় বিষ্ণুপুরে চীকের অনুগতজনদের সাথে স্থানীয় তালুকদারের সংঘর্ষের সম্ভাবনা জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এড়ানো গিয়েছিল।

১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব থেকেও জেলা ছিল মুক্ত। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কেবল বাঁকুড়ায় স্থিত সেনা রেজিমেন্ট অন্যদল দিয়ে পরিবর্তিত করা হয়। বরং পুরুলিয়ার সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার জন্য ছাতনারাজ কোম্পানীকে লোকবল ও উপকরণ দিয়ে সাহায্য করে। আর ১৮৫৬-১৮৫৭ খ্রীঃ বাঁকুড়া-বীরভূম-

সিংভূম-হাজারীবাগ-ভাগলপুর মুঙ্গের কেন্দ্রিক সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল মূলত মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে জনজাতিদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। বাঁকুড়ায় এ বিদ্রোহের অভিঘাত ছিল স্বল্পানুভূত।

১৮৯০ খ্রীঃ বাঁকুড়া শহরে মিশনারী বিরোধী দাঙ্গা দেখা দিয়েছিল। এর কারণ ছিল পাঁচাল গ্রামের উচ্চবর্ণীয় কন্যাকুব্জ ব্রাহ্মণ অমৃতলাল পান্ডে ও পার্বতী পান্ডের পুত্র কুলদাপ্রসাদ পান্ডের ধর্মান্তকরণ। ২০ বছর বয়স্ক কুলদাপ্রসাদ ছিলেন কুচকুচিয়া ওয়েসলিয়ান মিশনের ছাত্র। তাকে সে বছর ২৫ ডিসেম্বর ধর্মান্তরিত করেন রেভাঃ ডব্লু স্পিক। এই ঘটনায় বাঁকুড়ায় বিশেষত শহরের কন্যাক্যুব্জ ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত পাঠক পাড়ায় ব্যাপক অসন্তোষ তৈরী হয়। রানীগঞ্জ থেকে দুজন মিশনারী যখন বাঁকুড়ায় ফিরছিলেন তখন দোলতলায় তারা উত্তেজিত জনতার হাতে আক্রান্ত হয়। স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ রামনাথ মুখার্জী তাদের উত্তেজিত জনতার হাত থেকে রক্ষা করেন। উত্তেজিত জনতা কুচকুচিয়া মিশনারী বিদ্যালয় পুড়িয়ে দেন। তবে এই দাঙ্গা এরপরই স্তিমিত হয়ে পড়ে।

বর্তমান বাঁকুড়া জেলার উদ্ভব

উনিশ শতকের শেষের কয়েক দশকে সাউথ ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি ও পশ্চিম বর্ধমান নাম্নী দুই প্রশাসনিক বিভাগ বিবিধ প্রশাসনিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান বাঁকুড়া জেলায় রূপান্তরিত হয়। যেমন—

১। ১৮৪৭ খ্রীঃ ৫ আগষ্ট, পঃ বর্ধমান থেকে আউসগ্রাম পাথসিয়া, ইন্দাস থানা বর্ধমানে

২। ১৮৫১ খ্রীঃ ৫ মে বুদবুদ মহকুমা পঃ বর্ধমান থেকে বর্ধমানে।

৩। ১৮৬৯ খ্রীঃ ২৮ আগষ্ট, রানীগঞ্জ থেকে রঘুনাথপুর ও গৌরান্ডী বাঁকুড়া জেলায়।

৪। ১৮৭১ খ্রীঃ ১ জুলাই, ১৮৭২ খ্রীঃ ১৭ জুন বিজ্ঞপ্তিতে জেলার দেওয়ানী ফৌজদারী রাজস্ব এক্তিয়ারের পরিবর্তন।

৫।১৮৭২ খ্রীঃ ১৭ জুন কোতুলপুর, সোনামুখী, বর্ধমানে।

৬।১৮৭২ খ্রীঃ ১৭ সেপ্টেম্বর কোতুলপুর, সোনামুখী, ইন্দাস বাঁকুড়ায় ফিরে আসে। আর আসে ছাতনা, রানীগঞ্জ, কাঁকসা।

৭। ১৭৭৯ খ্রীঃ ১৯ নং আইনে সিমলাপাল, খাতড়া, রাইপুর বাঁকুড়ায় সংযুক্ত। ৩০ ডিসেম্বরের বিজ্ঞপ্তিমূলে আন্তঃজেলা সীমান্ত নির্ধারিত হয়।

৮।১৭৭৯ খ্রীঃ ২৭ সেপ্টেম্বর সুপুর, জয়পুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল, ভোলাইডিহা, ফুলকুসমা পরগণা ও শ্যামসুন্দরপুর বাঁকুড়ার সাথে যুক্ত হয়। বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবশেষে সরকার ১৪ মার্চ ১৮৮১ খ্রীঃ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে পূর্ণাঙ্গ বাঁকুড়া জেলার সৃষ্টি করে ও স্বতন্ত্র বিচারক নিয়োগ করে। Notification-টি হল, "The 14th March 1881 – Whereas His Excellency the Governor General in council has created a new Zillah viz. the District of Bankura. It is hereby notified that so much of the notification of the 6th April 1880, published in the Calcutta Gazette of the 7 items as relates to the amalgamation of the District Judgeship of East Burdwan and West Burdwan (Bankura) is hereby cancelled."

The above order shall have effect from the 1st April next. (Order of the secretary Mr. H.A. Cockerel 1881 March 16)

ব্রিটিশ শাসিত বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক ও অন্যান্য প্রশাসকদের নাম নিম্নে বর্ণিত হল :

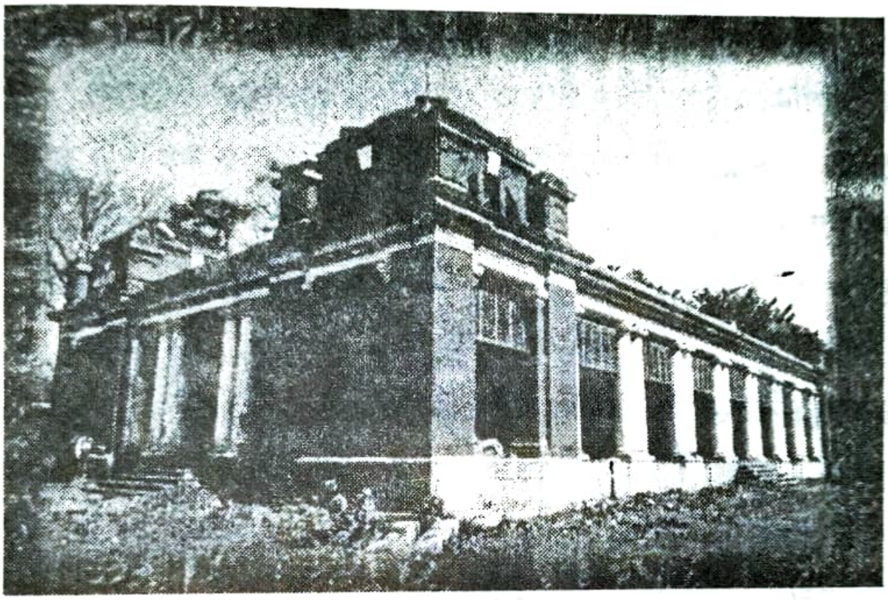
জেলাশাসক	সময়কাল
রমেশচন্দ্র দত্ত CS	১৮৮০-১৯.১০.৮১
জে এফ আন্ডারসন	২০.১০.৮১-২৫.১০.৮৩
এম জি মার্লি	১৮৮৭-১৮৯০
এফ এইচ বরো	১৮৯১-৯৩
এম মর্লো	১৮৯৪-
ভিনসেন্ট	১৮৯৫-২৭.৭.৯৫
ই এন কনষ্টাম	২৮.৭.৯৫-১৬.১১.৯৫
ভিনসেন্ট	১৭.১১.৯৫-৩০.৩.৯৬
এম বি চ্যাটারটন	৩১.৩.৯৬-১৮৯৮
আর কে দেব	১৮৯৯-১৭.৯.০২
এল এস এস ও ম্যালী ICS	১৮.৯.০২-১৬.২.০৩
জে এন গুপ্তা	০১৭.২.০৩-১৯০৬
এম সি লিডিয়ার্ড	১৯০৬-১৯০৭

আর কিরস্কলে	১৯০৭-১৯০৯
এ আহমেদ	১৯১০-১৯১১
এ ডব্লু ক্যুক	১৯১২-১৯১৭
জে সি ভাস	১৯১৭-১৯২০
এস এন রায়	১৯২০-১৯২১
জি এস দত্ত	১৯২২-১০.১৯২৩
সুকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৯২৩
বি ডি হাজরা	১১.১৯২৩-০৪.১৯২৪
জে সি ফ্রেঞ্চ	০৫.১৯২৪-০৪.১৯২৬
এফ জি হার্ট	০৫.১৯২৬-০৩.১৯২৭
এন সাইমনস	০৩.১৯২৭-১১.১৯২৭
এস জি হার্ট	১৯২৮-১৯৩০
জে এম ব্যানার্জী	১৯৩১-০৪.১৯৩২
ই ডব্লু হল্যান্ড	০৫.১৯৩২-০৮.০৩.৩৪
টি সি রায়বাহাদুর	৯.৪.৩৪-৩০.৬.৩৫
জে এম চ্যাটার্জী	১.৭.৩৫-২১.৮.৩৭
খান বাহাদুর মঃ আলি চৌধুরী	২২.৮.৩৭-২০.১০.৩৭
এ ডোনাল্ড ক্লার্ক	২০.১০.৩৭-২০.৫.৩৮
এস বি ভাপাট	১১.৫.৩৬-০৯.৩৮
এস কে হালদার	৭.৯.৩৮-১৬.৬.৩৯
এম কৃপালনী	২০.৬.৩৯-২.১০.৩৯
এস কে হালদার	৩.১০.৩৯-০৩.৬.৪০
এস সি মজুমদার	১৫.৭.৪০-২৭.৭.৪১
এ কে ঘোষ	১১.৮.৪১-১৯.৯.৪২
এফ এ করিম	২৩.৯.৪২-৭.৪.৪৩
আর সি দত্ত	৮.৪.৪৩-৬.৬.৪৫
ই আর কিচিন	৬.৬.৪৫-২৭.৭-৪৫
রায় ডি এন সেন	৩১.৭.৪৫-১৪.৩.৪৭
এ বি চ্যাটার্জী	১৫.৩.৪৭-৫.৮.৪৭
এস এন মিত্র	৮.৮.৪৭-৩.১১.৪৭

এই পর্বের জেলা-বিচারকদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

জেলা জজ	সময়কাল
ব্রজেন্দ্র শীল	১৮৮১-১৮৮৮
জি ডব্লু গ্লাস	১৮৮৯
ব্রজেন্দ্র কুমার শীল	১৮৯০-৯১
বি জি গাইতি	১৮৯২-১৮৯৩
জি গর্ডন	১৮৯৪
সি ডব্লুই পিটার	১৮৯৫
বি জি গাইতি	১৮৯৬-৯৭
ডব্লু আরলী	১৮৯৮
কে এন রায়	১৮৯৯-১৯০০
ই ই ফস্টার	১৯০১
এ সি সেন	১৯০২-০৫
বি সি মিত্র	১৯০৬-১৯০৮
জে এস ঘোষ	১৯০৯
জে এন মুখার্জী	১৯১০
রামনাথ দত্ত	১৯১১
এন পালিত	১৯১২
সি বার্টলে	১৯১৩
সি টিন্ডাল	১৯১৪-১৬
জোহমষ্টন	১৯১৭-১৮
এস সি মল্লিক	১৯১৯
গিরিশ চন্দ্র সেন	১৯২০
এইচ এম ভীচ	১৯২১-২৩
ইদাৎউল্লাহ	১৯২৪-২৬
জে দে	১৯২৭-৩১
এইচ গুপ্তা	১৯৩১
বি কে বাসু	১৯৩২-৩৩
এস কে গাঙ্গুলি	১৯৩৪-৩৭

জি ব্যানার্জী	১৯৩৭-৩৯
এস কে হালদার	১৯৩৯-৪০
এ এস রায়	১৯৪১-৪৩
এস গুপ্তা	১৯৪৩-৪৫
এ সি সান্যাল	১৯৪৫-৪৭
আর এস ত্রিবেদি	১৯৪৭
এ বি মল্লিক	১৯৪৭-৪৮



বাঁকুড়া আদালত ভবন

জেলার আইন শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত আরাক্ষাধ্যক্ষগণ ছিলেন :

আরক্ষাধ্যক্ষ	সময়কাল
জে এইচ মানুগ	৭.৪.২৯-৬.১২.৩১
জে এল জেন কিং	৪.১.৩১-৭.১০.১৯৩১
বি সি দাশগুপ্ত	৭.১০.৩১-১২.৯.৩২
এস এন চ্যাটার্জী	১৩.৯.৩২-১৭.৫.৩৩
এস সি ব্যানার্জী বাহাদুর	১৮.৫.৩৩-৭.১.৪০
জব্লু জে কোটাম	৭.১.৪০-৮.৪.৪১
এম টি ক্লিয়ারী	৮.১.৪১-২০.২.৪২
এম ইদ্রিস	২০.২.৪২-৫.৩.৪২
এম এ ইইচ মাসুদ	৫.৩.৪২-১৫.৭.৪২
রায়বাহাদুর বি সি দাশগুপ্ত	১৫.৭.৪২-২৭.১২.৪৫

এ কে এম হাফিজউদ্দিন	২৭.১২.৪৫-১৪.৮.৪৭
বি সি চ্যাটার্জী	১৪.৮.৪৭-১০.৪.৪৮

উল্লেখ্য ১৮৬৯ খ্রীঃ আরাক্ষধ্যক্ষ ছিলেন জে এম জি চীক ও তার আগে ছিলেন ভি এ ওয়াট।

জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্ব প্রাপ্ত সিভিল সার্জনরা ছিলেন ঃ

সিভিল সার্জেন	সময়কাল
ডাঃ রসিকলাল দত্তমিত্র	১৮৭৮-৮৪
ডাঃ সি আর এম গ্রীণ .	১৮৯৬
ডাঃ ভি এল ওয়াটস	১৯০১-০৯
ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ হাজরা ডাঃ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য	} ১৯২৫-
ডাঃ ই এইচ সি ম্যাকওয়ার	১৯৩৮-

এর আগে সরকার নিযুক্ত চিকিৎসকেরা ছিলেন ঃ

রামচন্দ্র সেন কবিরাজ	১৮০৮
রামপ্রসাদ কবিরাজ	১৯.০৪.১৮১৩-০৫.২০
গোবর্ধন কবিরাজ	৪.০৭.১৮২০-০৫.২১
ডাঃ টমাসলীক	১৮১২-১৪
ডাঃ জি এন চীক	১১.৮.১৮২১-১৮৬০
ডাঃ সী পলিমার	১৮৬০
ডাঃ এইচ সী কোনালী	১৮৭২
ডাঃ উইলসন	১৮৮৮

জেলার জেলরদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

নাম	সময়কাল
জব্বু	১৮০৭-
মুলচাঁদ	১৮০৯-
হুসেন কেস	১৮১৩
শেখ গুমানী	--
রাধালাল	--

মতিলোল্লাহ	--
এ্যান্ডুজ	১২/০২/১৮৬০-
ফ্রিচলি	১৮৬৭-

বাঁকুড়া জেলা ঃ দুর্ভিক্ষতত্ত্ব — ধর্মগোলা ও সেচব্যবস্থা

১৮৮১ খ্রীঃ নবসৃষ্ট বাঁকুড়া জেলার প্রশাসন শিক্ষা বিস্তার, স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সেচ-সমবায়, খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করলেও নব বাঁকুড়ার অন্ধকারময় অধ্যায় ছিল দুর্ভিক্ষ ও রোগমৃত্যু।

ক্ষুদ্র জোত ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাব কৃষি সমাজকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়। অর্থনীতিবিদ রবার্টসনের রিপোর্ট মোতাবেক এসময় সদর মহকুমার ৫৪০০৩৭ একর জমিতে জোত ছিল ২১৯৫৬৪ এবং বিষ্ণুপুর মহকুমার ২৪৫৬৯৯ একর জমির জোতের সংখ্যা ছিল ২০৩১৬৭। গড়পড়তা জোতের পরিমাণ ছিল ১.৮৬ একর। গ্রামীণ কৃষিসমাজের গড়পড়তা পারিবারিক জোত ছিল ২টি। বৃষ্টিনির্ভর এক ফসলী এই কৃষিজমির পরিবার প্রতি পরিমাণ ছিল ৩.৭২ একর। দোফসলী জমির পরিমাণ ১০ শতাংশের কম। তৎকালীন পরিবারের গড়পড়তা সদস্য ছিল ৪.৫ জন। উল্লিখিত পারিবারিক জোত থেকে সারাবছরের প্রাপ্তি ছিল ২১ মন ৮ সের চাল অর্থাৎ পরিবার পিছু দৈনিক চাল ২ সের ১৩ ছটাক যা প্রাত্যহিক দিনযাপনের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। ১৮৭১ খ্রীঃ জেলা শাসকের প্রতিবেদনে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এর উপর ছিল মহাজনী শোষণ। ১৮৭৮ খ্রীঃ হান্টারের হিসাবমত কৃষিঋণের সুদ ছিল ১৮ থেকে ৩৬ শতাংশ বার্ষিক। ১৯২৯ খ্রীঃ ব্যঙ্কিং তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী এই হার ছিল ১৫-৩৭.৫%। মদভাটি ও গোলদারী দোকান ছিল সাধারণ মানুষকে প্রতারিত ও শোষণ করার অন্যতম যন্ত্র। মহাজনী চক্রান্তে কৃষক নিজ জমি উচ্ছিন্ন হয়ে খারাপ জমিতে দু-তিনগুণ বেশী খাজনায় বা সেই জমিগুলিতেই কড়া শর্তে (সাজা বন্দোবস্ত) চাষ করে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেত। ১৯১৭-২৪ খ্রীঃ সময়ে রায়তদের এক চতুর্থাংশই সাজা প্রথার চাষীতে পরিণত হয়েছিল। ১৯২৭ খ্রীঃ জেলাশাসক এফ জি হার্ট এক প্রতিবেদনে এই সাজা প্রথা ও ফসলে খাজনা দেওয়ার প্রথাকে কৃষকের পক্ষে সাংঘাতিক ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেছেন।

জমিদারদের বিরুদ্ধে রায়তদের অসন্তোষের চিত্র পাওয়া যায় কমিশনারকে লেখা কালেক্টর সি এন স্যামুয়েলসের (১৮৮৩-৮৬) পত্রাঙ্ক ৯৯-ডি/৫০-৪-৪৫ তাং ২৯/৪/৮৫-এ। এতে বলা ছিল "সিমলাপাল জমিদারের রায়তেরা তাঁর বিরুদ্ধে

একজোট হয়েছে এবং ফলস্বরূপ চলছে নিরন্তর মামলা মোকদ্দমা। খাতড়ার মুন্সেফ উভয়পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া অব্যাহত রেখেছেন।” বাঁকুড়া জেলার (পঃ বর্ধমান ও অধুনা বাঁকুড়া) অনটনের বছর গুলি ছিল ১৮৬৬, ১৮৭৪, ১৮৮৫, ১৮৯৭, ১৯০৮, ১৯১৬, ১৯১৯, ১৯২৫, ১৯২৭-২৮, ১৯৩০-৩১, ১৯৩৭, ১৯৪৩, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। মূলত অনাবৃষ্টি ও শষ্যহানি এই অনটনের কারণ হলেও কালোবাজারী, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, মহাজনী শোষণ, ভূমিনীতি প্রভৃতিও ছিল অনটনের কারণ।

১৯১৭-২৪ খ্রীঃ সেটলমেন্ট প্রতিবেদন অনুসারে বাঁকুড়ার ১০১৯৯৪১ জনসংখ্যার ২৭ শতাংশই ছিল ক্ষেতমজুর। মজুরি ও দ্রব্যমূল্য মজুরদের প্রতিকূল না হলেও মদ্যপান, আলস্য, অশিক্ষা, অমিতব্যয়িতা মজুরদের দুর্দশার কারণ ছিল (সূত্রঃ কালেক্টর, রমেশ দত্ত ও হান্টারের প্রতিবেদন)। নিম্নতালিকায় বিভিন্ন বছরের মজুরি ও দ্রব্যমূল্য উল্লেখিত হল—

সাল	পুরুষ মজুরি (আনা)	নারী মজুরি (আনা)	শিশু শ্রমিক মজুরি (আনা)	ছুতোর মজুরি (আনা)	কামার মজুরি (আনা)	চালের দাম সের/টাঃ	ছোলার দাম সের/টাঃ	লবনের দাম সের/টাঃ
১৮৯৩	৩	১.৫	১	৪	৪	১১ সে ১২ ছ	১৩ সে ৮ ছ	১১ সের
১৮৯৫	৩	১.৫	১	৫	৪	২০ সে ১০ ছ	১৬ সের	১১ সের
১৮৯৭	৩	১.৫	১	৪	৪	১১ সে	১০ সের	১০ সের ৮ ছ
১৮৯৯	৩.৫	১.৭৫	১.৭৫	৪.২৫	৫	১৭ সের ৮ ছ	১৫ সের	১০ সের
১৯০২	৩	১.৭৫	২	৪	৪	১৫ সে ৮ ছ	১৫ সের	১১ সের
১৯০৫	৩.২৫	১.৭৫	২	৬	৫	১৬ সে	১৪ সের	১৬ সের ১০ছ
১৯০৮	৪.৫	২.২৫	৩	৭	৬.৫	১৭ সে ৮ ছ	৮ সের ৮ ছ	২০ সের
১৯১১	৫	২.৫	৩	৯	৭.৫	১৩ সে	১৪ সের ৪ ছ	২২ সের

একজন নিম্নবর্গীয় চাষীর বছরে মোটআয় ছিল মোটামুটি ১৬৮ টাকা, ব্যয় ছিল প্রায় ১৫৬ টাকা। এরমধ্যে খাওয়া দাওয়া ১২০ টাকা, জামাকাপড় ১৫ টাঃ, খাজনা ১৫ টাকা, বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত মজুর-বেতন ৫টাকা, কৃষি যন্ত্রপাতি, অলঙ্কার-সামাজিক অনুষ্ঠান বাবদ ১০ টাকা। সুতরাং সাধারণ অবস্থাতে কৃষকের দিনযাপন সম্ভব হলেও বিবাহ, রোগভোগ ইত্যাদি কারণে সর্বোপরি অজন্মার বছরে কৃষক খাদ্যসঙ্কটে ও ঋণজালে পতিত হত। ১৮৬২ খ্রীঃ বাঁকুড়ার শ্রমজীবী শ্রেণীর দৈনিক অন্নগ্রহণ ছিল ৭৫৬ গ্রাম যা পুষ্টির মাপকাঠিতে সন্তোষজনক।

কৃষিকাজের সুবিধার্থে ও খাদ্যনিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বাঁকুড়া জেলা গঠনের প্রথম দুই দশকে সেচ সমবায় ও ধর্মগোল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সদর মহকুমার ২৪ টি সেচ সমবায়ের মধ্যে ছিল ৮টি সিমলাপাল থানার, ৬টি গঙ্গাজলঘাটি

থানায়, ছাতনা থানায় ১টি, রায়পুর থানায় ৫টি। বিষ্ণুপুর মহকুমার ১টি মাত্র সেচ সমবায় ছিল পাত্রসায়র থানায়। ১৯২৪-২৫ খ্রীঃ সদর মহকুমার গঙ্গাজলঘাটিতে ধর্মগোলা সমবায় সমিতি ছিল ৫টি, ছাতনায় ১টি। বিষ্ণুপুর মহকুমার পাত্রসায়েরে ২টি, সোনামুখীতে ২টি। মহাজনী শোষণ থেকে শিল্পী ও শিল্প মজুরদের রক্ষা করতে বাঁকুড়ায় গঠিত হয়েছিল জেলা সমবায় শিল্প ইউনিয়ন লিমিটেড। এর অন্তর্গত সমবায় সমিতি ১৯২৩-২৪ খ্রীঃ ছিল ৫৪ টি এবং ১৯২৪-২৫ খ্রীঃ ৬৬ টি। এর মধ্যে তাঁতীদের ৫৫টি। কেন্দ্রীয় সমিতি সদস্যদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও উপকরণের সরবরাহ ও উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাতে মহাজনী অত্যাচার অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯২৫-২৬ খ্রীঃ ১৭০ সমিতির সদস্য ছিল ৭০৭৩। ১৯২৬-২৭ খ্রীঃ তা ছিল যথাক্রমে ১৬৫ ও ৭০৫৬। এই দুই অর্থবর্ষে কার্যকরী মূলধন ছিল যথাক্রমে ১৬৯৩২৬ টাকা ও ১৭২০১৩ টাঃ।

শষ্যবীজ বৈচিত্র আনয়নে ১৯২২ খ্রীঃ বাঁকুড়া শহরে ২৯ একরের কৃষি খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জেলাশাসক গুরুসদয় দত্তের (১৯২২-১৯২৩ খ্রীঃ) উদ্যোগে যে জেলা কৃষি ও হিতসাধনী সমিতি গড়ে ওঠে তার অন্যান্য সভ্য ছিলেন দুই মহকুমা শাসক, বি রায় (সম্পাদক), প্রসন্ন ব্যানার্জী, অমরেশ মুখার্জী, শশাঙ্ক ব্যানার্জী, অতুল চট্টোপাধ্যায় সহ ৫০ জন। কৃষি সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর উদ্যোগে কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিজ্ঞানী প্রফুল্ল রায় ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২ খ্রীঃ। তাঁর উদ্যোগে গঠিত জলসরবরাহ ও অর্থদান ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টররা ছিলেন হরিকিষণ রাঠী, বৈদ্যনাথ ঘটক, রাসবিহারী ব্যানার্জী সহ ৬ জন। কৃষি ও কৃষি সেচের প্রসারে জেলা প্রশাসনের প্রচেষ্টা কলকাতাতেও প্রশংসিত হয়েছিল। লর্ড লিটন ১৯২৪ সালের ৭ ই জানুয়ারী বাঁকুড়া পরিদর্শনে আসেন, এই সেচ প্রকল্পগুলির অগ্রগতি দেখতে। তিনি তালডাংরা থানার আমজোড় ও রুক্মিনী খালের খননের কাজ পরিদর্শন করে। এ সময় জেলা শাসক ছিলেন বি. ডি. হাজরা। তাঁর সময়েই ওন্দার রামসাগরের বিড়াই খাল প্রকল্প অনুমোদিত হয়। লিটন পুনিশোলের রেশম গুটি প্রকল্পও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের পর খুশী লর্ড লিটন জেলাশাসক হাজরাকে লিখেছিলেন "অনাবৃষ্টির জন্যে শষ্য না জন্মালে যে ভীষণ বিপদ ঘটে, তা সমাধান করার জন্য নিজগ্রামে সেচ সমবায় সমিতিগুলি যে কাজ করছে তা অত্যন্ত উৎসাহজনক। দরিদ্র শ্রেণীর লোকও কীরূপ সমৃদ্ধি ও সম্পত্তি অর্জন করতে পারে, এই সকল সমিতির সভ্যরা তা দেখিয়েছেন। এবং জেলার ভবিষ্যতের পক্ষে এটি আশাব্যঞ্জক ...। এদের প্রশংসনীয় উদ্যোগকে আমি মনে রাখব এবং এই উদ্যোগকে

যাতে যথার্থ উৎসাহ দেওয়া হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখব। ..... জেলার কৃষি ও হিতসাধনা সভার কাজের বিষয়টিও জেনেছি, যা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ধন্য তাদের চেষ্টা, ২৬০০০ বিঘা জমি যাতে অনাবৃষ্টি জনিত শষ্যহানি ছিল স্বাভাবিক, এখন তা সে অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা পেয়েছে।" গভর্ণর কেসির পরামর্শ মতো ১৯৪৩-র মহামারীর পর জেলা বোর্ড কয়েকটি সেচ প্রকল্প মহাত্মাগান্ধীর মাধ্যমে গভর্ণরের কাছে পাঠায়। প্রকল্পগুলি তৈরী করেছিলেন জেলাবোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে জেলা শাসক জেলা পরিকল্পনা সমিতি অনুমোদিত ৩০ টি ও অতিরিক্ত ২৪ সেচ প্রকল্প পাঠালেও স্বাধীনোত্তর কাল পর্যন্ত ছাগলকুটা জোড় ও মোলবাঁধ সেচ পরিকল্পনা ছাড়া বাকী প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয়নি।

বিভিন্ন উন্নয়নের কাজ সত্ত্বেও নবগঠিত বাঁকুড়াকে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস থেকে মুক্ত করা যায়নি। যদিও দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি ছিল আঞ্চলিক। ১৮৬৫-৬৬ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ ছিল জেলার দক্ষিণভাগে ও পশ্চিমাংশে। আর বিষ্ণুপুর শহর ও সন্নিহিত অংশে। ১৮৭৩-৭৪ খ্রীঃ আক্রান্ত ছিল জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ (মেজিয়া-শালতোড়া-গঙ্গাজলঘাটি)। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ছিল সোনামুখী-বড়জোড়া-গঙ্গাজলঘাটি অঞ্চল এবং ১৮৯৭ খ্রীঃ ছাতনা, সিমলাপাল, রাইপুর, উত্তর সোনামুখী থানা। কালেক্টর আর কিরস্কলে (১৯০৭-১৯০৯ খ্রীঃ) ও কমিশনার এস এল ম্যাডক্সের হিসাবে ১৮০৮ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ কবলিত ছিল রাইপুর থানার দুই তৃতীয়াংশ (৭৩০০০ জন), খাতড়ার অধিকাংশ (৫২০০০ জন), সিমলাপাল (৩০০০০ জন), তালডাংরা (২৫০০০ জন)। ১৮৯২ খ্রীঃ ১৫ এপ্রিল কালেক্টর ব্যারো (১৮৯১-১৮৯৩ খ্রীঃ) ত্রাণকাজে জেলাবোর্ডকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বোর্ডকে বর্ধমান জেলা বোর্ডের মত পুকুর ও কূপ খননের পরামর্শ দেন।

এই সব দুর্ভিক্ষে সরকারী সাহায্যের পাশাপাশি অসরকারী সাহায্যও দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা হ্রাস করতে পারেনি। নিম্নছকে সরকারী ও অসরকারী সাহায্যের বহর দেখান হল।

অনটনের বছর	সরকারী সাহায্য	সমিতিগত ও ব্যক্তি উদ্যোগ	সর্বোচ্চ ধানের দাম
১৮৬৬	ত্রাণ প্রাপক জুলাই-এ ৫০০০, আগষ্টে ৫১৭৫, সেপ্টেম্বর ৮২২৩, অক্টোবর ১৪৮১৮। মোট ১০৭৮২৮ জন খয়রাতী সাহায্য ও ২১৩৬৫ জন ত্রাণের কাজ পায়।	বিষ্ণুপুর শহর ও সন্নিহিত এলাকায় ত্রাণ কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়।	৩/৪ সের টাকায়

অনটনের বছর	সরকারী সাহায্য	সমিতিগত ও ব্যক্তি উদ্যোগ	সর্বোচ্চ ধানের দাম
১৮৭৪	মে মাসে ত্রাণ প্রাপক ১২০০০ (খয়রাতি ৯০০০, টেষ্টত্রাণ ৩০০০), জুলাই এ ৩৩০০০। ভূমি উন্নয়ণ ও কৃষি ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪৪৬৬০ টাকা। মে মাসে আউস ধান বীজ বিতরণ করা হয়। জুলাইয়ে ত্রাণ কাজ পান ৪১০০, যা ১৩০০০০ টাকার। তৈরী হয়েছিল সেতুসহ ১৪০ মাইল রাস্তা।	জমিদার দামোদর সিং, চাঁদ রায় ব্যাবসায়ী আলি জমিন ত্রাণে অংশ নেন। ৯০০০ কারিগরকে সাহায্য করা হয় ৮৫০৯০ টাঃ উপকরণ ও মজুরি দিয়ে। তাঁতিদের ৬৩০০ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়।	১১.৫ সের / টাকা
১৮৮৫	জুন মাসে প্রত্যহ গড়ে ২৮৬০ জনকে খয়রাতী সাহায্য দেওয়া হত, ১০ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের খয়রাতী প্রাপক ছিলেন ১৩৬৩৫। সোনামুখী থানায় ১৫০০০ টাকার কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছিল।	কালেক্টর সি এন স্যামুয়েলসের রিপোর্টে দেখা যায় বাঁকুড়ার হরি দত্ত, বিষ্ণুপুরের উন্মেশ চৌধুরী, বীরসিংহপুরের ক্ষেত্র ব্যানার্জীরা ত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন।	
১৮৯৭	এ বছর খয়রাতী সাহায্য ছিল ৮৫৫২০৫ ও টেষ্ট রিলিফের কাজ পেয়েছিল ৩১৮৫৭৭ জন।	শালতোড়া বেঁকার রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায়প্রতিদিন ৫০০ লোককে অন্ন প্রদানের ব্যবস্থা করেন। জেলাশাসক এম চ্যাটারটন এই ত্রাণ ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন।	
১৯০৮	জানুয়ারীতে ৩৮২৫০, ফেব্রুয়ারীতে ৪৬৫৯০, মার্চে ১৩০৬২০, এপ্রিলে ১৬৭৬৭০, মে ১৮০০০০, জুনে ১৭৪০৯০, জুলাইয়ে ১৭৪১৫০, জুলাইয়ে ৫৩৮৫০, আগষ্টে ৩৫০১০, সেপ্টেম্বর ৬০১৫০। ৬ শতাংশ সুদে ৬ বছরে পরিশোধ যোগ্য ভূমি উন্নয়ন ঋণ ছিল ৮৭৬৭৬ টাঃ। কৃষিঋণ ছিল ৭০৪৮৪ টাকা। টেষ্ট রিলিফে মাঝারি শক্ত ২০০ সিএফটি মাটি কাটার মজুরি ছিল ৬.৫ আনা। ২৭ শে জানুয়ারী ৪টি কাজে যুক্ত ছিল ২০০২ জন।	গিসবর্ণ-র ম্যানেজার নীলকর লিডিয়ার্ড রাইপুর বাংলো ত্রাণ কাজে ছেড়ে দেন। রাইপুর-খাতড়া-সিমলাপাল ত্রাণ কমিটির সংগ্রহ করেছিল ২২৫ টাঃ ১৩ আ, ১১৭ টা ৮ আ ৬ পাই, ১৯১ টাকা। বাঁকুড়া ত্রাণ কমিটি সংগ্রহ ছিল ৬২৭ টা ৯ আ ৬ পাই। ১৯৭ টি ভদ্রলোক রিলিফ, তাঁত রিলিফ, চাল, কাপড় বীজ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।	

অনটনের বছর	সরকারী সাহায্য	সমিতিগত ও ব্যক্তি উদ্যোগ	সর্বোচ্চ ধানের দাম
১৯১৬	অনটনগ্রস্থদের শুভঙ্করী খালের সংস্কার ও দশ আনি, ছ-আনির মুখ বাঁধাইয়ের কাজে লাগান হয়।	রেভঃ মিচেল, গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ, রামকৃষ্ণ মিশন, বাঁকুড়া সম্মেলনী ত্রাণকাজ করে। জেলজজ সি টিন্ডাল তাঁত রিলিফ কমিটি গঠন করেন।	
১৯১৯	১০ ফেব্রুয়ারী জি আর বিলি শুরু। ১৫ মে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা। একদিনে সর্বাধিক জি আর প্রাপক ছিলেন ১৬০৫৪ ও রিলিফ কাজে উপস্থিতি ছিল ১৮০৬৭। তাঁতীদের ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। জেলাবোর্ড ২৮১৪ মন বার্মা চাল আমদানি করে।	জেলাশাসক ভাস, রেভাঃ ব্রাউন, রেভঃ স্পুনার, এ জহার হোসেন, বসন্ত নিয়োগী, প্রসন্ন ব্যানার্জী, সত্য সাহানা, রামনাথ মুখার্জীদের নিয়ে ৫৩ জনের জেলা চ্যারিটেবল ফেমিন রিলিফ ফান্ড গঠিত হয়। এডগার মেমোরিয়াল হলে (উল্লেখ্য ১৯১১ খ্রীঃ এই হলের উদ্বোধন করেছিলেন জেলাশাসক এ আহমেদ) ১৮ই জানুয়ারী ২৯৩৭০ টাকা আদায় হয়।	৬ সের টাকা প্রতি ধান, কাপড় ও সরষের তেলের দাম ২ গুণ হয়।

এছাড়া ১৯৩৫ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষে মনীন্দ্র ভূষণ সিংহ, কমলকৃষ্ণ রায়, তুষারকান্তি ঘোষের প্রচেষ্টায় অমরকাননে ত্রাণ সমিতি গঠিত হয়। ত্রাণে অংশ নেয় বাঁকুড়া সম্মেলনী। ১৯৪৩ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষে ত্রাণকাজে অংশ নেয় শান্তশীল ও সুধীর পালিতের গুজরাটী সেবা সমিতি এবং ডাঃ দেবেন্দ্র সরকার, দুর্গাপদ নন্দীর বেতুড় ত্রাণ সমিতি। এদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন জেলাশাসক রবি দত্ত, শ্রীমতি দত্ত দম্পতী ও জেলাজজ শৈবাল গুপ্ত-অশোকা গুপ্ত দম্পতি। রাখহরি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদের সাহায্যে দুটি ত্রাণকেন্দ্র থেকে প্রত্যহ ১০০ জনের দুধ ও ১০০ জনের খাদ্য বিলি করতেন। এবছরের ২৬ সেপ্টেম্বর এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলের সভায় বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত, উর্মিলা মেহতা, রেণুকা রায়, ফুলরেণু দত্তের উপস্থিতিতে ব্যবসায়ী সত্যনারায়ণ বাজোরিয়া ১ লক্ষ টাকা ও দ্বারকাদাসের খাদ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। মোহনলাল গোয়েঙ্কা ট্রাষ্ট এসময় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। বাঁকুড়া

সম্মেলনী ত্রাণ কাজে সামিল হয়। এছাড়া ছিল বেণীপ্রসাদ খান্ডেওয়ালার মত উদার ধনী ব্যক্তির ত্রাণ কেন্দ্র।

১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষে ত্রাণকাজে অংশ নিয়েছিল রেড ক্রশ ও নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন। উল্লেখ্য এর ১০০ বছর আগের ১৮৪৪-৪৫ দুর্ভিক্ষে একমাত্র সহায় ছিল অতিস্বল্প সরকারী সাহায্য অথচ ১৮৪৬ খ্রীঃ কালেক্টর জর্জ লচের রিপোর্ট মোতাবেক দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল 'failure of crops' এবং তার ফলে চালের দাম ছিল টাকায় ১৬-১৮ সের ও মজুরি ছিল দৈনিক ১-৫ পয়সা।

ব্রিটিশ রাজত্বে বাঁকুড়ায় ধারাবাহিক অনটনের চলচ্ছবির মধ্যে উন্নয়ন ও আশার একটি চিত্র এঁকেছিলেন জেলাশাসক রমেন্দ্র দেব (১৮৯৯-১৯০২)। তাঁর ভাষায়, "There has been, on the whole, an increase in the property of the people. They evince a growing desire to provide themselves with better food, better clothing & better appliances generally. Gold and silver or ornaments are more common than ten years ago. Brass utensils have usurped the place of earthen pots; extensively used. How brick built houses are springing up everywhere, and articles of food which was formerly luxuries are now in common use." রমেন্দ্রদেব কৃষি উন্নয়নের জন্য শহরে একটি কৃষি সমিতি ভবন গড়ে তোলেন। (বর্তমান বি ডি সি সি ব্যাঙ্ক পার্শ্বস্থ সমবায় ভবন)।

<u>দুর্ভিক্ষের বিবিধ কারণ ও জেলা প্রশাসনের ভূমিকা ঃ</u>

১৮৬৬ খ্রীঃ ও ১৮৭৩ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষে অনাবৃষ্টি ও শষ্যহানি অন্যতম কারণ হলেও উৎপাদিত চালের বর্ধিত দামের আশায় অন্য জেলায় অনিয়ন্ত্রিত রপ্তানি জেলায় মূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্য সংকটের বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৬৬ খ্রীঃ হান্টার এই জেলা থেকে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপক ধান-চাল রপ্তানীর বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ যদিও ছিল কালেক্টর কেরলস্করির ভাষায় "decidedly an abnormal one in a meteorological point of view" তবুও তিনি অন্যান্য জেলায় এ জেলা থেকে ব্যাপক ধান-চাল রপ্তানীর কথা জানিয়েছেন। দৃশ্যতই এই অবাঞ্ছিত রপ্তানী রোখার ক্ষমতা জেলা প্রশাসনের ছিল না। কারণ ১৯১৬ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কেও জেলাশাসক এ ডব্লু ক্যাক খাদ্য সামগ্রী রপ্তানীকেই দায়ী করেছিলেন।

অজ্ঞতা, জন ও যান পরিষেবা বৃদ্ধি, স্বভাবতগত আলস্য কিন্তু শৌখিনতর জীবনের প্রতি ক্রমবর্ধমান টান, সঞ্চয় বিমুখতা এই রপ্তানীবৃদ্ধির ও খাদ্য সংকট আবাহনের সহায়ক হয়। ১৯৩৫ খ্রীঃ বর্ধমান কমিশনারকে জেলাশাসক টি সি বাহাদুরের লেখা পড়ে এই বিষয়গুলিকেই দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ১৮৬৬ খ্রীঃ বাঁকুড়া শহরে চালের অমিল হওয়ায় কলকাতা থেকে চাল আমদানী করতে হয়েছিল। ১৯৪৩ খ্রীঃ শুধুমাত্র বর্ধমানের রাণীগঞ্জ ও হুগলীর আরামবাগ-কালীপুরে চাল রপ্তানী হয়েছিল ৪০০০ বস্তা। জেলায় চালের দাম বেড়েছিল মন প্রতি ২৪ টাকা থেকে ২৮ টাকা। জেলায় গম আমদানী করতে হয়েছিল ৪৭১০ টন। পুলিশ সুপার ডি আই জি, বর্ধমান রেঞ্জকে জানিয়েছিলেন, পুলিশকে অখাদ্য সরকারী চাল সরবরাহ করার ফলে, ফোর্স পেটের রোগ ও শক্তিহীনতায় ভুগছে। ১৯০৮ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ ছিল লাগামহীন রপ্তানী। কারণ তার পূর্ববর্তী দুবছরের চাল রপ্তানী ছিল যথাক্রমে ৫২৮০১ মন ও ২১৪৯৪১মন, যেখানে আমদানী ছিল মাত্র ১৭৯৯৩ মন ও ৩৪৬৩ মন। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষগুলিকে তীব্রতা দেয়। কালোবাজারী ও চাল পাচার রোধে জেলা প্রশাসনের ব্যর্থতা অন্ন সংকটগ্রস্থ মানুষকে জোতদারের গুদাম লুন্ঠনের মত অপরাধে বাধ্য করেছিল। কারণ ১৮৪৮ খ্রীঃ কালেক্টর লচ যেমন সে বছর এধরণের অপরাধের হ্রাস ঘটার কারণ বলেছেন "effect of harvest" তেমনই ১৮৭৪ খ্রীঃ কালেক্টর কেরলস্করি বলেছিলেন, "Poverty is the main cause of offences against property in this district:" ১৮৬৬ খ্রীঃ অপর্যাপ্ত ত্রাণব্যবস্থার জন্য যেমন এধরণের অপরাধ বেড়েছিল, ১৮৭৪ খ্রীঃ পর্যপ্ত ত্রাণব্যবস্থার জন্যে এধরণের অপরাধের সংখ্যা ছিল অনেক কম।

১৯৪৩ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারীতে কালোবাজারী, মজুতদার ও অবাধ রপ্তানীর বিরুদ্ধে এক হাজার মানুষ জেলাশাসক এফ এ করিমের বাসভবন হিল হাউস পর্যন্ত ভুখা মিছিল করেন। ২৬ মার্চ সোনামুখী থানায় ৫০০ জনের গণনালিশ জমা পড়ে, এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আবার ১৮৮১ খ্রীঃ বাঁকুড়ায় প্রথম জেলাশাসক রমেশ দত্ত, নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস, ভূমিক্ষয়, অনাবৃষ্টি ও অজন্মাকে দুর্ভিক্ষের পেছনে বড় কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

দুর্ভিক্ষক্লান্ত বাঁকুড়ার আর এক অন্ধকার দিক ছিল রোগমৃত্যু। ১৮৬৬ খ্রীঃ বাঁকুড়ায় (তৎকালীন বিষ্ণুপুর) অন্নাভাব জনিত মৃত্যু ছাড়া ছিল কলেরা মহামারীজনিত মৃত্যু। দৈনিক ১১ টির বেশী মৃত্যু হতে থাকে। রাস্তাঘাটে মৃতদেহ পড়ে থাকে,

মানুষের হাতে দাহ করার অর্থ না থাকায়। শেষে সরকারী উদ্যোগে সৎকার শুরু হয়। উল্লেখ্য ১০০ বছর আগের ১৭৭০ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষে কৃষি সমাজের অর্ধাংশ ও মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। ১৮৬৪ খ্রীঃ বাঁকুড়ায় মোট ৪০ জেল কয়েদীর ১৫ জনই কলেরায় মারা যায়। ওলাউঠা ও আমাশয়ে আক্রান্তদের অনেকেই ছিলেন পুরীধামের তীর্থযাত্রী। আক্রান্তদের মৃতুর হার ছিল ২৩.৯%। এছাড়া ছিল ম্যালেরিয়া। ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ এই রোগ জেলায় মড়ক ডেকে আনে। এই রোগের প্রধান কেন্দ্র ছিল বিষ্ণুপুর। ১৮৮২ খ্রীঃ বিষ্ণুপুর শহর ও ইন্দাস থানায় এই রোগে মৃত্যুহার ছিল হাজারে ৪২, ১৮৮৩ খ্রীঃ ইন্দাসে হাজারে ৪৬, বিষ্ণুপুর থানায় হাজারে ৪২.৮ জন, সোনামুখী থানায় হাজারে ৩৮.৩ জন, কোতলপুর থানায় হাজারে ৩৮.১ জন। ১৮৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ছিল এই রোগের তীব্রতা ও মৃত্যুহার ছিল হাজারে ২০০ আশেপাশে। ১৮৯২ খ্রীঃ ২৫ শে এপ্রিল জেলাশাসক এফ. এইচ. ব্যরোর রিপোর্টেও প্রমাণিত হয় বিষ্ণুপুর মহকুমার রোগমৃত্যুর ঘটনা, কারণ ১৮৮১ খ্রীঃ তুলনায় ১৮৯১ খ্রীঃ বাঁকুড়া সদর মহকুমা ও বিষ্ণুপুর মহকুমার জনবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৭ ও ৪.৩৯ শতাংশ। একই কারণে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যায় ১৮৮১ খ্রীঃ থেকে, যেহেতু বিষ্ণুপুর মহকুমায় তাদের বাসই ছিল বেশী। পরবর্তীকালে ১৯৩১ ও ১৯৪৩ খ্রীঃ আবার মহামারী দেখা দেয়।

কলেরা ম্যালেরিয়া ছাড়া জেলায় ১৮৭৩-৭৪ খ্রীঃ হাম, গুটি বসন্ত, ১৮৯০ ও ১৯০১-০২ খ্রীঃ গুটি বসন্ত, ১৯১৯-২০ খ্রীঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা জেলায় মড়ক ডেকে আনে। গুটি বসন্তের কারণ সম্পর্কে ১৮৬৬ খ্রীঃ সিভিল সার্জন সি পলিমার পুরী তীর্থযাত্রীদের অংশত দায়ী করেছেন। তেমনই ১৮৮৮ খ্রীঃ সিভিল সার্জন উইলসন জেলমৃত্যুর পেছনে অপুষ্টির হাত আছে বলে মনে করতেন। জেল মৃত্যুর পরিসংখ্যান হল ১৮৫৫ খ্রীঃ ১৮ (৩২ মধ্যে), ১৮৫৭ খ্রীঃ ২, ১৮৫৮ খ্রীঃ ১, ১৮৫৯ খ্রীঃ ৩, ১৮৬০ খ্রীঃ ১১, ১৮৬১ খ্রীঃ ২, ১৮৬৪ খ্রীঃ ১৬, ১৮৬৫ খ্রীঃ ৮, ১৮৬৮ খ্রীঃ ২। ১৮৮০ খ্রীঃ ব্রিটিশ প্রশাসন বাঁকুড়া, সোনামুখী ও বিষ্ণুপুর পুরসভায় টীকা-দান আইনে টীকাদান বাধ্যতামূলক করে। শুধু চিকিৎসা প্রসারই নয় চিকিৎসক তৈরীর প্রয়াস হিসাবে বাঁকুড়া শহরে বাঁকুড়া সম্মিলনীর উদ্যোগে সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ খ্রীঃ এই বিদ্যালয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং ১৯৩৫ খ্রীঃ ৫ই জানুয়ারী কোতুলপুরের ভুতনাথ কোলে ও সুরেন্দ্রনাথ কোলের অর্থানুকুল্যে নির্মিত ৪০ শয্যার হাসপাতাল ও বিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন করেন বাংলার গভর্নর জন এ্যন্ডারসন।

বাঁকুড়ার ভৌগলিক ও পরিবেশগত কারণ, বিশেষত অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে সব্জীর পরিবর্তে বেশী মাংসভক্ষণের প্রবণতা কুষ্ঠ রোগের সহায়ক ছিল। ১৮৮১ খ্রীঃ ও ১৮৯১ খ্রীঃ কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৮৭৭ ও ৩৮৯৩। জেলাশাসক এফ. এইচ ব্যারো এই রোগের কারণ 'Scarcity of vegetables' বলেছেন। ছোঁয়াচে হওয়ার কারণে এই রোগের বিস্তার সম্পর্কে জেলাশাসক বি. দে বলেছিলেন 'found leprosy more among the Bunas, who had migrated there from Bankura and adjoining districts among local people'. ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জেলাশাসক সত্যেন্দ্রনাথ রায় 'কুষ্ঠরোগ নিবারণী সমিতি' গঠন করেন জেলাবোর্ড ও পুরসভার প্রধানগণ ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে। ১৮৭৮ খ্রীঃ কুষ্ঠ রোগ রোধের জন্য সরকারী প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন সিভিল সার্জেন ডাঃ রসিকলাল মিত্র। এই সালেই বাঁকুড়া পুরসভা কুষ্ঠ চিকিৎসার জন্য সরাইখানা (পুরানো বঙ্গ বিদ্যালয়) জেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তরের অনুরোধ করে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত না হতে পারায় শহরের উপকণ্ঠে বদরায় ১৯০১ খ্রীঃ ওয়েসলিয়ান মিশন কতৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্রায়ন লেপ্রোসি হোম'। ১৯৩০-৪০ খ্রীঃ ব্রিটিশ এমপোরিয়াল লেপ্রসি রিফিফ এ্যাসোসিয়েশনের ক্ষেত্রসমীক্ষা মোতাবেক শহর থেকে ১২ কিমি দূরে গৌরিপুর মৌজায় কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেওয়া হয় যা ১৯৪৯ খ্রীঃ রূপায়িত হয়।

১লা মার্চ, ১৯৪০ খ্রীঃ তৎকালীন জেলাশাসক সুধাংশু হালদারের সহধর্মিনী উষা হালদারের (অল ইন্ডিয়া উইমেন কনফারেন্সের বাঁকুড়া জেলা সভানেত্রী) উদ্যোগে তৈরী হয় 'মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল' কেন্দ্রের। উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০১-০২ খ্রীঃ এখানেই ছিল ২৮ শয্যার (২০ পুরুষ, ৮ মহিলা) লেডি ডাফরিন জেনানা হসপিটাল। বর্তমানে এটি সোসাল ওয়েলফেয়ার অফিস।

বাঁকুড়ায় স্বায়ত্তশাসন

১৮৮৫ খ্রীঃ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন প্রবর্তিত হলে এদেশের স্থানীয় নাগরিকদের প্রশাসন পরিচালনায় অংশ নেওয়ার অধিকার জন্মে। এই আইনের প্রস্তাবনাকালে অন্যান্য শহরের মত বাঁকুড়াতেও প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দের উদ্যোগে কয়েকশ মানুষের গণদরখাস্ত প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে পাঠান হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ আইনে গঠিত রোড সেস কমিটির স্থলাভিষিক্ত হয় নবকলেবরে গঠিত এই জেলা বোর্ড। আইন অনুসারে রোড সেস কমিটির চেয়ারম্যান হন জেলাশাসক। উক্ত সময়ের

জেলাশাসকরা ছিলেন কেরলস্করি, আর এম ওয়ালার, আর সি দত্ত, জে এফ আন্ডারসন, সি এন স্যামুয়েলস।

জেলাবোর্ডের সদস্য সংখ্যা হয় ২৪। এর মধ্যে ১০ জন বাঁকুড়া লোকাল বোর্ড দ্বারা নির্বাচিত, ৮ জন বিষ্ণুপুর লোকাল বোর্ড নির্বাচিত, ৬ জন সরকার মনোনীত। তেমনই বাঁকুড়া সদর লোকাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮। নির্বাচিত হতেন ১২ জন। প্রত্যেক থানা থেকে ১ জন (মেজিয়া-শালতোড়া ১টি) করে। ৬ জন সরকার মনোনীত। বিষ্ণুপুর লোকাল বোর্ডের ১৪ জনের মধ্যে ৮ জন ছিল নির্বাচিত ও ৬ জন সরকার মনোনীত।

১৮৮৫ খ্রীঃ জেলা বোর্ড চালু হলে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সদর থেকে বোর্ডে নির্বাচিত হন কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী, বসন্তকুমার নিয়োগী, বিনোদবিহারী মন্ডল, আলি জামিন প্রমুখ। খাতড়া থেকে নির্বাচিত ছিলেন হাড়মাসড়ার জমিদার। অন্যান্য সদস্য ছিলেন পূর্বতন রোড সেস কমিটির ও জেলা বিদ্যালয় কমিটির নদের চাঁদ রায়, অযোধ্যার জমিদার বেণীমাধব ব্যানার্জী ও কুচিয়াকোলের জমিদার রাধাবল্লভ সিং। বোর্ডের চেয়ারম্যানরা হলেন ডব্লু ভি জি টেলর (১৮৮৫ নভেম্বর ১৮৯০), এফ এইচ ব্যারো (নভেম্বর ১৮৯০- মার্চ ১৮৯৪)। ভাইস চেয়ারম্যানরা ছিলেন কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯০৮)। বসন্ত নিয়োগী (আগষ্ট ১৯০৮-সেপ্টেম্বর ১৯১৯), মৌলবী ফজলুর রহিম (অক্টোবর ১৯১৯-১৯২৫)।

১৮৯০ খ্রীঃ প্রকাশিত সরকারী গেজেট মোতাবেক জেলা সদস্যরা হলেন বাঁকুড়া লোক্যাল বোর্ড থেকে কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ও বসন্ত কুমার নিয়োগী; বিষ্ণুপুর লোকাল বোর্ড থেকে গোরাচাঁদ গোস্বামী, সৈয়দ ফজলুর রহমান ও বরদা প্রসাদ রায়, পদাধিকার বলে সিভিল সার্জেন ও বিদ্যালয় ডিআই, সরকার মনোনীত কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ স্কেলস, প্রতাপনারায়ণ সিংহ, বিনোদবিহারী মন্ডল।

১৯০৬-০৭ খ্রীঃ ও'ম্যালীর মতে জেলা বোর্ডের সদস্য ছিল ১৫। ৭ জন নির্বাচিত, ৪ জন সরকার মনোনীত, ৪ জন পদাধিকার বলে। এ সময় সদস্যদের ৪০ শতাংশ ছিল উকিল-মোক্তার, ২৬.৬ শতাংশ সরকারী কর্মচারী, ভুস্বামী ৫৩.২ শতাংশ। বোর্ডের হাতে ছিল রাস্তা, সেতু, ফেরি, পুকুর সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য, জল সরবরাহ, চিকিৎসা, ত্রাণ, প্রাথমিক শিক্ষা। বোর্ডের অধীনে গঠিত হয়েছিল অর্থ, পূর্ত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কমিটি।

১৯২০ সালে বোর্ডে প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন বামাচরণ রায়।

জেলাশাসকরা ছিলেন কেরলস্করি, আর এম ওয়ালার, আর সি দত্ত, জে এফ আন্ডারসন, সি এন স্যামুয়েলস।

জেলাবোর্ডের সদস্য সংখ্যা হয় ২৪। এর মধ্যে ১০ জন বাঁকুড়া লোকাল বোর্ড দ্বারা নির্বাচিত, ৮ জন বিষ্ণুপুর লোকাল বোর্ড নির্বাচিত, ৬ জন সরকার মনোনীত। তেমনই বাঁকুড়া সদর লোকাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮। নির্বাচিত হতেন ১২ জন। প্রত্যেক থানা থেকে ১ জন (মেজিয়া-শালতোড়া ১টি) করে। ৬ জন সরকার মনোনীত। বিষ্ণুপুর লোকাল বোর্ডের ১৪ জনের মধ্যে ৮ জন ছিল নির্বাচিত ও ৬ জন সরকার মনোনীত।

১৮৮৫ খ্রীঃ জেলা বোর্ড চালু হলে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সদর থেকে বোর্ডে নির্বাচিত হন কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী, বসন্তকুমার নিয়োগী, বিনোদবিহারী মন্ডল, আলি জামিন প্রমুখ। খাতড়া থেকে নির্বাচিত ছিলেন হাড়মাসড়ার জমিদার। অন্যান্য সদস্য ছিলেন পূর্বতন রোড সেস কমিটির ও জেলা বিদ্যালয় কমিটির নদের চাঁদ রায়, অযোধ্যার জমিদার বেণীমাধব ব্যানার্জী ও কুচিয়াকোলের জমিদার রাধাবল্লভ সিং। বোর্ডের চেয়ারম্যানরা হলেন ডব্লু ভি জি টেলর (১৮৮৫ নভেম্বর ১৮৯০), এফ এইচ ব্যারো (নভেম্বর ১৮৯০- মার্চ ১৮৯৪)। ভাইস চেয়ারম্যানরা ছিলেন কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯০৮)। বসন্ত নিয়োগী (আগষ্ট ১৯০৮-সেপ্টেম্বর ১৯১৯), মৌলবী ফজলুর রহিম (অক্টোবর ১৯১৯-১৯২৫)।

১৮৯০ খ্রীঃ প্রকাশিত সরকারী গেজেট মোতাবেক জেলা সদস্যরা হলেন বাঁকুড়া লোক্যাল বোর্ড থেকে কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ও বসন্ত কুমার নিয়োগী; বিষ্ণুপুর লোকাল বোর্ড থেকে গোরাচাঁদ গোস্বামী, সৈয়দ ফজলুর রহমান ও বরদা প্রসাদ রায়, পদাধিকার বলে সিভিল সার্জেন ও বিদ্যালয় ডিআই, সরকার মনোনীত কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ স্কেলস, প্রতাপনারায়ণ সিংহ, বিনোদবিহারী মন্ডল।

১৯০৬-০৭ খ্রীঃ ও'ম্যালীর মতে জেলা বোর্ডের সদস্য ছিল ১৫। ৭ জন নির্বচিত, ৪ জন সরকার মনোনীত, ৪ জন পদাধিকার বলে। এ সময় সদস্যদের ৪০ শতাংশ ছিল উকিল-মোক্তার, ২৬.৬ শতাংশ সরকারী কর্মচারী, ভূস্বামী ৫৩.২ শতাংশ। বোর্ডের হাতে ছিল রাস্তা, সেতু, ফেরি, পুকুর সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য, জল সরবরাহ, চিকিৎসা, ত্রাণ, প্রাথমিক শিক্ষা। বোর্ডের অধীনে গঠিত হয়েছিল অর্থ, পূর্ত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কমিটি।

১৯২০ সালে বোর্ডে প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন বামাচরণ রায়।

১৯২৫ খ্রীঃ চেয়ারম্যান হন কংগ্রেসের মণীন্দ্রভূষণ সিংহ এবং তিনি মধ্যে সংক্ষিপ্ত দুবার ছাড়া একটানা ১৯৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৪০ খ্রীঃ চেয়ারম্যান হন লীগের ডাঃ সিদ্দিকি। ১৯৩০ খ্রীঃ কয়েকমাস ছাড়াও ১৯৩৫ খ্রীঃ থেকে ১৯৩৭ খ্রীঃ ৩১ মার্চ পর্যন্ত জেলা বোর্ডে সরকার মনোনীত চেয়ারম্যান ছিলেন। এই দুবছর চেয়ারম্যান ছিলেন জেলাশাসক জে এম চ্যাটার্জী।

জেলা বোর্ড ছাড়াও লোকাল বোর্ড গঠন ও তার নির্বাচন গ্রামীণ স্বায়ত্ত্ব শাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ১৯১৭ খ্রীঃ লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে সদর মহকুমার নির্বাচক ছিলেন ৯২৪৮ এবং বিষ্ণুপুর মহকুমার নির্বাচক ছিলেন ৫৮৭৬। ১৯২৪ সালের নির্বাচনে সদর মহকুমার নির্বাচক বেড়ে হয় ১১৫২৫। ১৯২৪ খ্রীঃ সদর মহকুমার থানাওয়ারী নির্বাচক সংখ্যা হল বাঁকুড়া ১০১৬, ছাতনা ৮১০, ওন্দা ১৫১৫, তালডাংরা ৮৩৫, ইন্দপুর ৪৮০, খাতড়া ৮৩৭, রাণীবাঁধ ৬২৫, রাইপুর ১২৫০, গঙ্গাজলঘাটী ৬২৫, বড়জোড়া ১৩১৭, শালতোড়া ৭৭৩, মেজিয়া ৩৭৯, সিমলাপালে ৭৩২।

জেলাবোর্ডের আয়ের ধারা ছিল এরূপ, ১৮৯২-৯৩ সালে ৯৩৩৩১ টাঃ, ১৯০১-০২ সালে ১১৯৯৫৬ টাঃ, ১৯০৬-০৭ সালে ১৪৫১২০ টাঃ, ১৯১১-১২ সালে ১২২১৮৭ টাঃ ১৯১৩-১৪ সালে ১৭৭৭৬২ টাঃ, ১৯১৬-১৭ সালে ৩৯৪৩৮৬ টাঃ, ১৯১৮-১৯ সালে ২০৯৫৩৭ টাঃ, ১৯২২-২৩ সালে ২১০৫৯৪ টাঃ, ১৯২৩-২৪ সালে ২৫৬১৩৪ টাকা।

জেলা বোর্ডের আয়ের মূল অংশই হল রোড সেস ও ব্যয়ের মূল খাত ছিল শিক্ষা ও সিভিল ওয়ার্কস এবং স্বাস্থ্য। জেলা বোর্ডের সদর্থক ভূমিকাতে জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে জোয়ার আসে। ১৮৮১ খ্রীঃ সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২৮০ ও ৩০৯৮২ যা ১৮৯১ খ্রীঃ দাঁড়ায় ১৩৭৯ ও ৩৩৬৩০। ১৯০৬-০৭ খ্রীঃ জেলা বোর্ডের সাহায্যে প্রাপ্ত নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ৮০৮, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৬৯, ৪০টি মধ্য বিদ্যালয়, ২ টি উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯০৬-০৭ খ্রীঃ জেলাবোর্ড পরিচালনাধীন দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল ৩টি এবং আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল ৬টি।

বাঁকুড়া শহর প্রশাসন দেখভালের জন্য ১৮৬৮ খ্রীঃ ৬নং আইন মোতাবেক ১৮৬৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে জেলাশাসক জেসি গ্রান্টের সভাপতিত্বে গঠিত হয় ৪ সদস্যক টাউন কমিটি। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন পুলিস সুপার জে এন জি চীক, জমিদার হরিশঙ্কর মুখার্জী ও জেলা বার সভাপতি হরিহর মুখার্জী। হরিহরবাবু পরে

শহরের প্রথম বেসরকারী ভারতীয় চেয়ারম্যান হন। ১৮৬৯ সনে বাঁকুড়া পৌরসংস্থার কমিশনার ছিল ১২ জন। এদের মধ্যে ৮ জন নির্বাচিত, ১ জন মনোনীত, ৩ জন পদাধীকার বলে। প্রথম নির্বাচন হয় ১৮৮৩-৮৪ খ্রীঃ।

পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যানের তালিকা নিম্নরূপ—

চেয়ারম্যান	সময়কাল
ডব্লু এস ওয়েলস	১৮৬৫-৬৬
এইচ ক্লার্ক	১৮৬৭
জে পি গ্রান্ট	১৮৬৭-৬৯
ডব্লু টি টুচার	১৮৬৯-৭০
মেজর পোর্চ	১৮৭১
ডব্লু আর লারসিনি	১৮২২
জে আন্ডারসন	১৮৭৯-৮৫
এফ এস পেক	১০/২/৮৪- ৮/৫/৮৫
হরিহর মুখার্জী	৯/৫/৮৫- ৩১/৮/০০
নবগোপাল ব্যানার্জী	২৪/৯/০০-২২/৫/১৯০৩
বিনোদ বিহারী মন্ডল	২৩/৫/০৩-১৮/৫/০৬
ডব্লু সি লিডিয়ার্ড	১৯/৫/০৬- ৩০/৪/০৭
নবগোপাল ব্যানার্জী	১/৫/০৭-৬/৪/০৮
রাসবিহারী ব্যানার্জী	৭/৪/০৮-১৮/১০/১০
বসন্তকুমার নিয়োগী	২০/৮/১৪-৬/৯/১৫
রেভঃ জে মিচেল	৭/৯/১৫-২৪/১/১৭
রাসবিহারী ব্যানার্জী	১৭/৩/১৭-১৬/৩/১৯
রামনাথ মুখার্জী	১৭/৩/১৯-১৬/৬/২০
নগেন্দ্র ঘোষ	১৬/৬/২০-১৭/৪/২২
রাসবিহারী ব্যানার্জী	২৮/৪/২২-৭/৬/২৫
কমলকৃষ্ণ রায়	০৮/৬/২৫-১৭/৬/২৮
প্রমথনাথ চ্যাটার্জী	১৬/৬/২৮-৯/৮/৩৪
রেভঃ ই ব্রাউন	১০/৮/৩৪-১/৬/৩৬
হরিসাধন দত্ত	২/৬/৩৬-২/৫/৪৩
কালি মিত্র	৩/৫/৪৩-৭/২/৪৫

তারাগতি সামন্ত	১৫/২/৪৫-১৯/১/৪৮

ভাইস চেয়ারম্যান/সেক্রেটারী	সময়কাল
যাদব ঘোষ	১৮৬৫
জে আর হ্যালেট	১৮৬৬
কান্তিচন্দ্র চ্যাটার্জী	১৮৬৭
ডি রিচার্ড	১৮৬৮-৭০
এম রিচার্ড	১৮৭১
এইচ সি কোনালী	১৮৭২
আর এল দত্ত	১৮৭৯-৮৩
আর দীক্ষিত	১৮৮৩-৮৪
বিনোদ মন্ডল	১৮৮৪-২২/৫/০৩
রাসবিহারী ব্যানার্জী	২৩/৫/০৩- ৬/৪/০৮
গগনলাল পাঠক	৭/৪/০৮- ২৪/৭/০৯
বিশ্বনাথ মুখার্জী	২/৮/০৯- ১৮/১০/১০
গগনলাল পাঠক	২০/৮/১৪ -
নগেন্দ্র ঘোষ	৭/৯/১৫- ১৬/৩/১৯
সত্যকিঙ্কর সাহানা	১৭/৩/১৯- ২৮/১০/১৯
মৌলভী জাহেদার রহিম	১৯/১০/১৯-
গগনলাল পাঠক	২৮/৪/২২- ৭/৬/২৫
কালিকৃষ্ণ মিত্র	৮/৬/২৫- ১৭/৬/২৮
হরিসাধন দত্ত	১৮/৬/২৮- ২৩/৩/৩২
কালিকৃষ্ণ মিত্র	১৮/৪/৩২- ২৫/২/৩৯
নবকুমার সেন	২/৩/৩৯- ২/৫/৪৩
নকুলচন্দ্র মন্ডল	৩/৫/৪৩- ১৯/১/৪৮

বিষ্ণুপুর পুরসভার পুরপ্রধান তালিকা

পুরপ্রধান	সময়কাল
আর এম ওয়াকার	মাচ ১৮৭৯
কৃষ্ণ প্রসাদ ঘোষ	৩১/১২/৭৯

রামচরণ বোস	৩১/১২/৭৯-৩/৯/৮০
অক্ষয় চ্যাটার্জী	৩/৯/৮০-২৪/৩/৮২
তারাপ্রসাদ চ্যাটার্জী	২৪/৩/৮২-
গোরাচাঁদ গোস্বামী	-২৬/৩/৮৮
উমেশচন্দ্র চৌধুরী	২৬/৩/৮৮-২১/২/৯১
রাধিকালাল সোম	২১/২/৯১/২/৯/৯১
রামদাস ভট্টাচার্য্য	২/৯/৯১-১৮/৩/৯২
উমেশ চৌধুরী	১৮/৩/৯২-০১/৬/৯৭
ভোলানাথ ভট্টাচার্য	১/৬/৯৭-১৮/৬/০৩
কেদারনাথ ব্যানার্জী	১৮/৬/০৩
হৃষিকেষ সিংহ	১৯০৪-
অটলবিহারী বোস	১৯০৬-২/২/৩৭
উমেশ চৌধুরী	২০/২/০৭-২৩/৬/০৯
রাখালমোহন ব্যানার্জী	২৬/০৯-০৯-১৫/৬/১০
ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য	১৫/৬/১০-১৪/৬/১৫
এ সি টড	২৯/১/১৬-৭/৭/১৬
উমেশ চৌধুরী	৭/৭/১৬-২৯/৬/১৮
ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য	২৯/৬/১৮-২০/১০/২৫
অতুলচন্দ্র কর	২০/১০/২৫-২১/২/২৮
হেমচন্দ্র কর	২১/২/২৮-১৪/৩/৩১
ভূবনেশ্বর কর	১৪/৩/৩১-১০/৭/৩৩
গুরুদাস বিশ্বাস	১০/৭/৩৩-৩১/১১/৩৭
হরভূষণ মন্ডল	৩০/১১/৩৭-৪/৮/৪৪
নরেন্দ্রনাথ কর	৪/৮/৪৪-৬/৬/৪৭
ভূদেবচন্দ্র মন্ডল	৬/৬/৪৭-৩১/১০/৫১

সোনামুখী পৌরসভা প্রবর্তনের পর ১৮৮৬ খ্রীঃ পৌরবোর্ডের প্রথম মনোনীত সভাপতি ছিলেন মিঃ ব্যারোজ। প্রথম নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন রাধাগোবিন্দ বন্দোপাধ্যায়। অন্যান্য পৌরকর্তারা ছিলেন-

(১৮৮৭-১৯৩৩ সময়কালের পুর প্রধানদের তালিকা পাওয়া যায়নি।)

পুর প্রধান	সময়কাল
অশোক প্রসাদ মুখার্জী	১৯৩৪-৩৫
দিবাকর দে	১৯৩৬
বিজয় কুমার নিয়োগী	১৯৩৬
ভূদেব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৯৩৭-৩৯
কৃষ্ণদাস বন্দোপাধ্যায়	১৯৪০-৪১
বীরেন্দ্র কুমার মুখার্জী	১৯৪১
গোপাল বন্দোপাধ্যায়	১৯৪২-৪৭

হিন্দুরাজ শাসনে মন্ডল প্রথা ও ষোল আনা প্রথা, মল্লরাজপুষ্ট ঘাটোয়াল, সীমান্দার গুরুত্ব হারায় ইংরেজ আমলের ক্ষমতাবান চৌকিদার ও রাজ অনুগ্রহপুষ্ট জমিদার-পাত্তনিদারদের কাছে। ক্রমশ ইংরেজ প্রবর্তিত ইউনিয়ন বোর্ড অনেকটাই ক্ষমতা ও সম্মানের স্থান দখল করে। তবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের হার ও মাত্রা ছিল শ্লথ ও স্থবিরতাগ্রস্থ।

বিট্রিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, চার্লস টেগর্টের বাঁকুড়া অভিযান, পুলিশ সুপার ও বিষ্ণুপুর মহকুমাশাসককে হত্যা প্রচেষ্টা ঃ মৌলানা আজাদের গ্রেপ্তারি

বাঁকুড়ায় বিভিন্ন বিপ্লবীর অবস্থান ও উপস্থিতিতে বিপ্লবী কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বেঁধেছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই। কালেক্টর সি এন স্যামুয়েল বলেছিলেন, "the younger class of native here, more specially boys in the schools evince more interest on political subjects." তৎকালীন বাঁকুড়া শহরের রামদাস পালোয়ানের কুস্তির আখড়ার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হরিহর মুখার্জী যিনি বাঁকুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন ১৮৮৫ থেকে ১৮৯০ সন পর্যন্ত। প্রখ্যাত বিপ্লবী বারীন ঘোষ এই হরিহর মুখার্জীর গৃহে রাত্রিবাস করেছিলেন বলে জানা যায়। বারীন ঘোষ অস্ত্রের সন্ধানে একবার বিপ্লবী বিভূতিভূষণ সরকারকে পাঠিয়েছিলেন রামদাস (চক্রবর্তী) পালোয়ানের কাছে।

বিপ্লবী নরেন্দ্র গোস্বামীর জমিদারি কাছারি ছিল খাতড়ার মসিয়াড়া গ্রামে এবং অম্বিকানগরের প্রাক্তন জমিদার বিক্ষুব্ধ রাইচরণ ধবলের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। রানিবাঁধ থানার ছোঁদাপাথরের ময়ূর পাহাড় ছিল ক্ষুদিরাম, সত্যেন বসুদের মত বিপ্লবীদের আস্তানা ও প্রশিক্ষণ শিবির। আলিপুর বোমা মামলায় রাজসাক্ষী নরেন

গোস্বামী এসব তথ্য প্রকাশ করলে কলকাতা থেকে পুলিশ কর্তা চার্লস টেগার্ট বাঁকুড়ার বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বড় অভিযান করেন। রাইচরণকে গ্রেপ্তার করা হয় যদিও পানু রজক নামে স্থানীয় একজন পূর্বেই সাবধান করে দেওয়ায় রাইচরণ সব প্রমাণ সরিয়ে ফেলেন। ফেরার পথে বাঁকুড়া শহরের বিপ্লবী বাড়ীর মত বিপ্লবী আস্তানা তল্লাসী করে এই পুলিশ দল রামদাস পালোয়ান, সুরেন মুখার্জী, সুরেন মণ্ডল প্রমুখ বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করেন। অম্বিকানগরে বারীন ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, প্রফুল্ল চাকীদের যাতায়াত ছিল। টেগার্টের অভিযানে বিপ্লবী আন্দোলন ভাল ধাক্কা খায়।

বাঁকুড়ার বিপ্লবীরা বেশ কয়েকটি সফল 'স্বদেশী লুণ্ঠনে' অংশ নেন। তিনের দশকে গড়বেতার বেঙ্গল কোল কোম্পানীর টাকা লুঠে বাঁকুড়ার বিপ্লবীদের ভূমিকা ছিল। তারা সাফল্যের সাথে বিষ্ণুপুর-তাঁতিপুকুরে ডাক লুঠ করেন। ১৯৩৪ খ্রীঃ যুগান্তরদল কোতুলপুরের মির্জাপুরে একটি মেল ডাকাতিতে অংশ নেয়। মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিমল সরকারের নেতৃত্বে কাঞ্চনপুর মেল ডাকাতি হয় ১৯৩২ খ্রীঃ ২২ শে অক্টোবর। লুণ্ঠিত হয় ১৫০০ টাকা। জয়পুর মেল ডাকাতিতে লুণ্ঠিত হয়েছিল দুহাজার টাকা। ১৯৩২ খ্রীঃ ৬ই এপ্রিল রাইপুর সার্কেল অফিসারের একটি রিভলবার ও একটি বন্দুক লুণ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপুর রাসমঞ্চ থেকে বিগ্রহের অলঙ্কার লুণ্ঠনে জড়িত ছিলেন বিপ্লবী বিমল সরকার, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী, বীরেন্দ্র সিংহদেব। এই মামলায় আদালত মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীকে ৫ ও ১০ বছর ও অন্যান্যদের ৫ বছরের কারাদন্ড দেয়। জেলার রাজনৈতিক মামলায় মৃত্যুঞ্জয়বাবুর সাজাই ছিল সর্বোচ্চ। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে বাঁকুড়া আদালতে বারাণসীর বিখ্যাত বিপ্লবী শচীন সান্যালের বিরুদ্ধে প্রথম রাজনৈতিক মামলা জনমানসে আলোড়ন ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। রাজদ্রোহিতা মূলক প্রচারপত্র বিলির অভিযোগে তাঁর ২ বছর কারাদন্ড হয়। এছাড়া অস্ত্র তৈরীর অভিযোগে গঙ্গাজলঘাটির হৃষিকেশ কর্মকার ও সিমলাপালের নারায়ণচন্দ্র দাস ও রেবতী মোহন সাহা গ্রেপ্তার হন।

বিপ্লবী আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বড় ব্যর্থ ঘটনা ছিল বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসক নেপাল সেন, জেলা পুলিশ সুপার বি সি. দাসগুপ্ত ও লাটসাহেব আন্ডারসন হত্যা প্রচেষ্টা। কুমিল্লার মহকুমা শাসক থাকার সময় বিপ্লবীদের উপর কঠোর আচরণের জন্য কুখ্যাত নেপাল সেনকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয় যুগান্তর দল। দায়িত্ব পড়ে বিপ্লবী বিমল সরকার ও বীরেশ্বর ঘোষের উপর। কিন্তু তুর্কীর জঙ্গলে রিভলবার-গুলি নিয়ে মহড়ার খবর প্রশাসনের কাছে পৌঁছালে এই পরিকল্পনা বাতিল হয়। অন্য একটি মতে প্রহরীদের তৎপরতায় বিপ্লবীরা মহকুমা শাসকের বাংলোয় ঢুকতে ব্যর্থ

হয়। এসময় জেলাশাসক ছিলেন ই ডব্লু হল্যান্ড (১৯৩২-৩৪)। ১৯২৮ খ্রীঃ বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলি বাঁকুড়ায় এলে তাঁকে কালীতলার 'পুলিশ ক্লাব মেসে' নজরবন্দী করা হয়।

১৯৩১ খ্রীঃ অনুশীলন দল পুলিশ সুপার বি সি দাসগুপ্তকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। চট্টগ্রাম থেকে নীরদবরণ দত্ত এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য বাঁকুড়ার বেতুড়ে গিয়ে তারানাথ, বিভূতিভূষণ ও বীর রাঘবের সাথে মিলিত হন ও বালেশ্বরের এক ইঞ্জিনিয়ারিং (কটক কলেজ) ছাত্রের কাছে তারানাথের হাতে এই পরিকল্পনা সম্পর্কিত চিঠি পাঠান। কিন্তু ডিসেম্বরে তারানাথ বাঁকুড়া রেল স্টেশনে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তখন জেলাশাসক ছিলেন জে এম ব্যানার্জী। বেতুড় থেকে বিপ্লবীরা পালান। ১৯৩৪ খ্রীঃ যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির রাজ্য শাখা মিলিত ভাবে লাটসাহেব এ্যান্ডারসনকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঁকুড়ার সম্মিলনী মেডিক্যাল হাসপাতাল ও স্কুলভবনের উদ্বোধন করতে এলেও, বাঁকুড়ার বিপ্লবীরা তার সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়। স্পষ্টতই ১৯৩০ খ্রীঃ থেকে ১৯৩৫ খ্রীঃ বিপ্লবীদের দ্বারা উচ্চআধিকারিকদের হত্যা প্রচেষ্টায় জোয়ার আসে। এই অশান্ত সময়ে বাঁকুড়ার জেলা শাসকেরা হলেন এস জি হার্ট, জে এম ব্যানার্জী, ই ডব্লু হল্যান্ড, টি সি রায়বাহাদুর ও জে এম চ্যাটার্জী।

১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে বাঁকুড়া সক্রিয় অংশ নেয়। বাঁকুড়ার অবিনাশ রায়, চন্দ্রশেখর সেন, কাশিনাথ অধ্বর্যু, উপেন্দ্র দাস, উমেশ চট্টোপাধ্যায়, কালীকুমার ঘোষ, বিষ্ণুপুরের রাধাগোবিন্দ রায়, কোতুলপুরের ভুবনমোহন মুখার্জী বিলাতী বস্ত্র, নুন, চিনি সহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি বর্জন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ১৯০৭-০৮ খ্রীঃ প্রশাসন ২৩ টির মত মামলা ঋজু করে।

১৯১৯ খ্রীঃ লোকমান্য তিলকের মহাপ্রয়াণের পর 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা তাঁর সম্পর্কে অশোভন উক্তি করলে দেশের অন্যান্য অংশের মতই বাঁকুড়াতেও এই পত্রিকা বর্জন আন্দোলন শুরু হয়, অধ্যাপক অনিলবরণ রায়ের নেতৃত্বে। খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাউনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই কলেজে ছাত্রসমাবেশ ও দোলতলায় জনসমাবেশ করা হয়।

১৯২১ খ্রীঃ অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষ্যে বাঁকুড়া জেলায় কংগ্রেসের সংগঠন গড়ে ওঠে। প্রত্যেক থানা থেকে ১জন করে নিয়ে গঠিত জেলা কমিটির সম্পাদক হন মণীন্দ্রভূষণ সিংহ ও সভাপতি গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ (এই দেশনেতার নামে বাঁকুড়া শহরের একাংশ গোবিন্দনগর নামে পরিচিত)। এই আন্দোলনের সময় আদালত ও

স্কুল কলেজ বর্জন করে বহু জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। ১৯২১ খ্রীঃ ১৭ নভেম্বর যুবরাজ এডওয়ার্ড ভারত সফরে বোম্বে পদার্পণ করলে বাঁকুড়ার অনেকে কলকাতায় প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করে। ১৯২১ খ্রীঃ তিলক স্বরাজ্য ভান্ডারের অর্থ সংগ্রহের জন্য দেশবন্ধু বাঁকুড়া আসেন আর একই উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া আসেন মহাত্মা গান্ধী ১৯২৬ খ্রীঃ ৮ই জুলাই। সঙ্গে এসেছিলেন নজরুল ও সতীশ দাশগুপ্ত। সকালে অমরকাননে ও বিকালে লালবাজারের গোপাল নন্দীর ধানকল চত্বরে বিশাল জনসভা করেন গান্ধিজী। এছাড়া জেলায় এসেছিলেন দেশবন্ধু, রাখাল ঘোষ, বিপিন চন্দ্র। আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে জাতীয় ও জেলা নেতাদের প্রচেষ্টায় জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় বাঁকুড়ায়। যার ফলে ১৯২৪ খ্রীঃ ৭ জানুয়ারী গভর্নর লিটনের বাঁকুড়া সফর বয়কট করে জেলাবাসী। ফিডার রোড দিয়ে আদালত সন্নিকটের সভায় তাঁকে আনা হয়। খ্রীষ্টান কলেজের ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করে। ১৯২৬ খ্রীঃ সার্কিট হাউসের পূর্বের সিপাহীডাঙ্গা মাঠে কংগ্রেসের প্রথম রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হেমপ্রভা মজুমদারের সভাপতিত্বে। ১৯২৭ খ্রীঃ নিবারণ দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে ২য় সম্মেলন হয় বিষ্ণুপুরে। ১৯২৮ খ্রীঃ খাতড়ায় ৩য় এবং ১৯২৯ খ্রীঃ কোতুলপুরে ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। খাতড়া সম্মেলনে ইউনিয়ন বোর্ড ও চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সমগ্র জেলায় তা আন্দোলন আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ১৯৩০ খ্রীঃ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে বাঁকুড়ায় জনজাগরণ সৃষ্টি হয় ও ১২০০ সত্যাগ্রহী কারারুদ্ধ হন। ১৯৩০ খ্রীঃ ৬ই এপ্রিল কাঁথির পিছাবনী গ্রামের সমুদ্রতীরে বাঁকুড়া জেলার সত্যাগ্রহীরা আইন অমান্য করেন। কারারুদ্ধ সত্যাগ্রহীদের উপর মেদিনীপুরের জেলাশাসক পেডি অমানবিক অত্যাচার করেন। তার বুটের আঘাতে পাঁজর ভেঙে মৃত্যুমুখে পতিত হন বেতুড়ের পঞ্চানন পালিত।

জেলা কংগ্রেসের ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে জেলা প্রশাসন ভীষণ বিব্রত হয়। বিষ্ণুপুরে এই আন্দোলনের তীব্রতা না কমায় বাঁকুড়ায় মুখ্যসচিব একজন সার্জেন্ট ও ২৫ সিপাহীর এক বাহিনী অক্টোবর মাসের প্রথমার্ধে প্রেরণ করেন। তবে জেলাশাসক বিষ্ণুপুরে ট্যাক্স আদায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ১৯২৭ খ্রীঃ বিষ্ণুপুরে কর আদায় ছিল ধার্য্য করের অর্ধেক। ১৯৩০ সালে ২০ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসন বেতুড়ে কর আদায়কারী দল পাঠায়। অনিচ্ছুক করদাতাদের (১৬ টি পরিবার) জিনিসপত্র ক্রোক করা হয়। ১৯৩০ খ্রীঃ ১৮ জুলাই জেলাশাসক ঘটনার গুরুত্ব অনুভব করে কমিশনারকে অনুরোধ করেন যাতে জেলায় 'বে-আইনী প্ররোচনা অর্ডিন্যান্স' জারি

হয়। হদলনারায়ণপুরে সব ইউনিয়ন বোর্ড সদস্য ও চৌকিদার পদত্যাগ করলে জেলাশাসক নতুন তহশীলদার নিয়োগ করেন ও কর আদায়ের জন্য মহকুমাশাসক, সার্কেল অফিসার, ইন্সপেক্টর ও ১৫ জন সশস্ত্র পুলিশ সেখানে প্রেরণ করেন। ১৯৩২ খ্রীঃ পাত্রসায়রের কালিজ্ঞরতলায় ১৩ ফেব্রুয়ারী কর বন্ধের সমর্থনে জনসভায় সুষমা পালিত ও শৈলবালা দে পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হলে সুষমার ৩ বছর কারাদন্ড হয়। শৈলবালা ফেরার হন। ৯ ই মার্চ একই স্থানে বিন্দু বাসিনী ও তিনকড়ি দেবী সভা করতে এলে পুলিশ এসে তা ভেঙে দেয়। ১৯৩১ সালে মে মাসে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বাঁকুড়াতে এসে আন্দোলনকারীদের উৎসাহিত করেন। ১৯৩০ খ্রীঃ ৭ মে জেলাশাসক কমিশনারকে জানান যে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় ৬ মে সফল বনধ্ পালিত হয়েছে। মনীন্দ্রভূষণ সিংহের সভাপতিত্বে বাঁকুড়ায় শোভাযাত্রা ও দোলতলায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপুরে কংগ্রেস কর্মীরা ট্রেজারী অভিযান করলে মহকুমাশাসকের অনুপস্থিতিতে সেকেন্ড অফিসার নিষেধাজ্ঞা জারি করে। মারমুখী জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৩০ খ্রীঃ ১০ জুন মুখ্যসচিবকে লেখা কমিশনারের পত্র থেকে বয়কট আন্দোলনের তীব্রতা বোঝা যায়। আইন-আদালত বর্জন, পিকেটিং ছাড়াও সরকারী কর্মচারীদের বাড়িতে পাচক-ভৃত্যও বয়কট করা হয়। ১৯৩১-৩২ খ্রীঃ মেদিনীপুরের ৩ জেলাশাসককে বিপ্লবীরা পরপর খুন করলে বাঁকুড়ার তৎকালীন কালেক্টর জে এম ব্যানার্জীর নিরাপত্তা দৃঢ় করা হয় এবং বাঁকুড়া ও বাঁকুড়ামুখী সব সড়কে সেনাবাহিনী কুচকাওয়াজ শুরু করে। ১৯৩২ খ্রীঃ ডগলাস হত্যা মামলায় বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্যকে ফাঁসি দেন বিচারপতি তারক বসু। এরপর বিচারক বসুকে বাঁকুড়ার বাসভবনে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়। গান্ধীজী পুরুলিয়া থেকে হাওড়া ফেরার পথে বাঁকুড়ার মানুষ ও জননেতাদের সাথে শেষ আলোচনা সভা করেছিলেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া ষ্টেশনে।

১৯৪২ খ্রীঃ ভারতছাড় আন্দোলনের তীব্রতা বাঁকুড়া জেলায় ছিল আপেক্ষিকভাবে কম। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অগ্নিসংযোগের ঘটনা ছাড়া তেমন বড় নাশকতামূলক ঘটনা বাঁকুড়ায় ঘটেনি। ১৯৪০ খ্রীঃ কংগ্রেসের কর্মীরা জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এফ ক্লিয়ারী এবং থানার ওসিকে ব্যাক্তিগত সত্যাগ্রহের নোটিশ দেন। যদিও তৎকালীন বাঁকুড়া থানার ওসি, পুলিশ সুপারের সাথে যখন সত্যাগ্রহীদের একটি গুপ্ত সভায় হানা দেন , ওসি সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে এস.পি তাকে বলেন "These individuals (satyagrahis) are small fries and

should be neglected. You need not be worried." বস্তুত ৪২-এর আন্দোলন শুরু করার প্রস্তুতি সভা থেকে জেলার শীর্ষ নেতৃত্বের ১৭ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে আন্দোলনের মেরুদন্ড ভেঙে যায়। ১৯৪৫ খ্রীঃ জাতীয় নেতা আবুল কালাম আজাদ বাঁকুড়ায় আন্দোলন চাঙ্গা করতে এলে জেলা প্রশাসন তাঁকে এপ্রিল -মে মাসে নীলকর সাহেবদের পূর্বতন বাসভবন গুপ্ত এস্টেটে (মেডিকেল কলেজ পাশ্বস্থ NCC ভবন) অন্তরীণ করে। এসময় জেলাশাসক ছিলেন রবিচন্দ্র দত্ত ও পুলিশ সুপার বি সি দাশগুপ্ত। আগষ্ট আন্দোলন চলার সময় কংগ্রেসের অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও সুভাষ বসুর ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন বাঁকুড়া কংগ্রেসের সংহতি বিনষ্ট করেছিল। ১৯৪০ খ্রীঃ বীরেশ্বর ঘোষের আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র বসু বাঁকুড়া, খাতড়া, কেঞ্জাকুড়া ও ইন্দপুরে জনসভা করেন। এর আগে সুভাষচন্দ্র ১৯২৯ খ্রীঃ কোতলপুর জেলা কংগ্রেস সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ১৯৩৮ খ্রীঃ বিষ্ণুপুর প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি ও এম এন রায় উপস্থিত ছিলেন (উল্লেখ্য ১৯২৮ খ্রীঃ খাতড়া জেলা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যতীন্দ্রমোহন, বিপিনবিহারী, নিবারণচন্দ্র, বাসন্তীদেবী)। ১৯৩৯ খ্রীঃ গভর্ণর স্যার জন হারবার্ট যুদ্ধ তহবিল সংগ্রহে শহরে এলে ওয়েসলিয়ান কলেজ ছাত্ররা তাঁকে গার্ড অব ওনার দিতে অস্বীকার করে ও 'গো ব্যাক' পোষ্টারে শহর ভরিয়ে দেয়। ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয় ও ছাত্রনেতারা (ক্ষেত্রমোহন, শান্তব্রত, উদয়ভানু, মানিক দত্ত প্রমুখ) বহিস্কারের মুখে পড়েন। ১৯৪০-৪১ খ্রীঃ বন্দেমাতরম সঙ্গীত গাওয়া নিয়ে বিরোধে আরেকবার ছাত্রনেতারা ও ৪০০ ছাত্র বহিষ্কারের মুখে পড়েন। তবে ১৯৪৪ খ্রীঃ লর্ড কেসি বাঁকুড়া সফরে এত বিক্ষোভের মুখে পড়েননি। আর তিনের দশকে শহরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার দু-একটি ঘটনা ঘটলেও চারের দশকে তা ছিল নিয়ন্ত্রিত।

বাঁকুড়ায় ১৮৭ বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিভিন্ন সময়ে শাসন ধারা ও অগ্রাধিকারের নামচা ছিল স্বতন্ত্র। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকে প্রথম একদশক কোম্পানীকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে বিদ্রোহী রাজা-ভূস্বামীও জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে আনতে।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রাণসংহারী দুর্ভিক্ষ বাঁকুড়ার আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনে যা সামলাতেই ব্রিটিশ শাসকদের পরবর্তী দেড় দশকের বেশী সময় ব্যাপৃত থাকতে হয়। ১৭৭৩ খ্রীঃ সন্ন্যাস বিদ্রোহ, ১৭৮৫ খ্রীঃ পাহাড়ীয়া উপদ্রব ছিল দুর্ভিক্ষ জনিত দারিদ্র, বিপর্যয় এবং নয়া রাজস্বব্যবস্থা থেকে পথ খোঁজার সংগ্রাম। এই সময়কার চুয়ার বিদ্রোহের অভিঘাত অনুভূত হয়েছিল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, এমনকি

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই শতাব্দীর শেষ দুই দশকে রাজস্ব আদায় ও ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রসার অনেকটাই সংহত হয়েছিল। হিগনস, শেরবোর্ণ, কিটিং, অসওয়াল্ড থেকে বার্গেস প্রমুখ ব্রিটিশ শাসকেরা রাজস্ব আরোপ, বৃদ্ধি ও আদায়ে ছিলেন যথেষ্ট সফল। পাশাপাশি চীপ, এরস্কিনদের মত কোম্পানী (বানিজ্যিক) রেসিডেন্টরা কোম্পানীর বাণিজ্য স্বার্থকে বেশ সুরক্ষিত করে ফেলেছিলেন।

১৮০৫ খ্রীঃ থেকে ১৮১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত একদশকেরও বেশী সময় ইংরেজ জেলাশাসকদের নেতৃত্বে জেলাশহর হিসাবে বাঁকুড়া প্রতিষ্ঠা পায়। গড়ে ওঠে প্রাশাসনিক ভবনগুলি। কালেক্টর রাসেল ও হ্যালকটের (১৮২৯ খ্রীঃ ১৮৩০ খ্রীঃ) সময়েই আধুনিক ও ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন ঘটে বাঁকুড়ায়। এবং পরবর্তী এক শতাব্দী এই শিক্ষা সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে সার্বজনীন রূপ পায়। অথচ এর আগের এক দশক (১৮১৫খ্রীঃ -১৮২৮ খ্রীঃ) জেলা কালেক্টরেরা ব্যস্ত ছিলেন কুসংস্কারচ্ছন্ন সমাজজীবনে সতীদাহের মত কু-প্রথার নিয়ন্ত্রণ ও অবসান প্রয়াসে। কালেক্টর কেলভিনের প্রতিবেদনগুলি থেকে এই কুপ্রথার তৎকালীন অবস্থা অনুধাবন করা যায়। এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশক অপরাধিত্ব নিয়ন্ত্রণে ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রিটিশ শাসকরা অনেকটাই সফল হন।

১৮৮১ খ্রীঃ বর্তমান বাঁকুড়া জেলা প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রথম পাঁচ দশকেও বাঁকুড়াকে দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা যায়নি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লু ওয়েলস, কেরলস্করি, স্যামুয়েলস, চ্যাটারটন, কিরস্কেল, কুক, ভ্যাস, ফেগু, সাইমনস, জে এম ব্যানার্জী, মহঃ চৌধুরী, এফ করিম ও এ বি চ্যাটার্জীদের ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল দুর্ভিক্ষ ও অনটনক্লিষ্ট জেলাবাসীকে ত্রাণ সাহায্য দেওয়ার কাজে। ১৯১৭ খ্রীঃ থেকে ১৯২৪ খ্রীঃ পর্যন্ত জেলাশাসক জে সি ভ্যাস, এস এন রায়, জি এস দত্ত, বি ডি হাজরার নেতৃত্বে বাঁকুড়ায় কেন্দ্রীয় শিল্প সমবায় সহ বিভিন্ন সমবায় ধানগোলা, বিভিন্ন সেচ প্রকল্প রূপায়িত হলে কৃষিক্ষেত্রে এবং খাদ্যোৎপাদন ও খাদ্যনিরাপত্তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সহায়ক পরিবর্তন ঘটে।

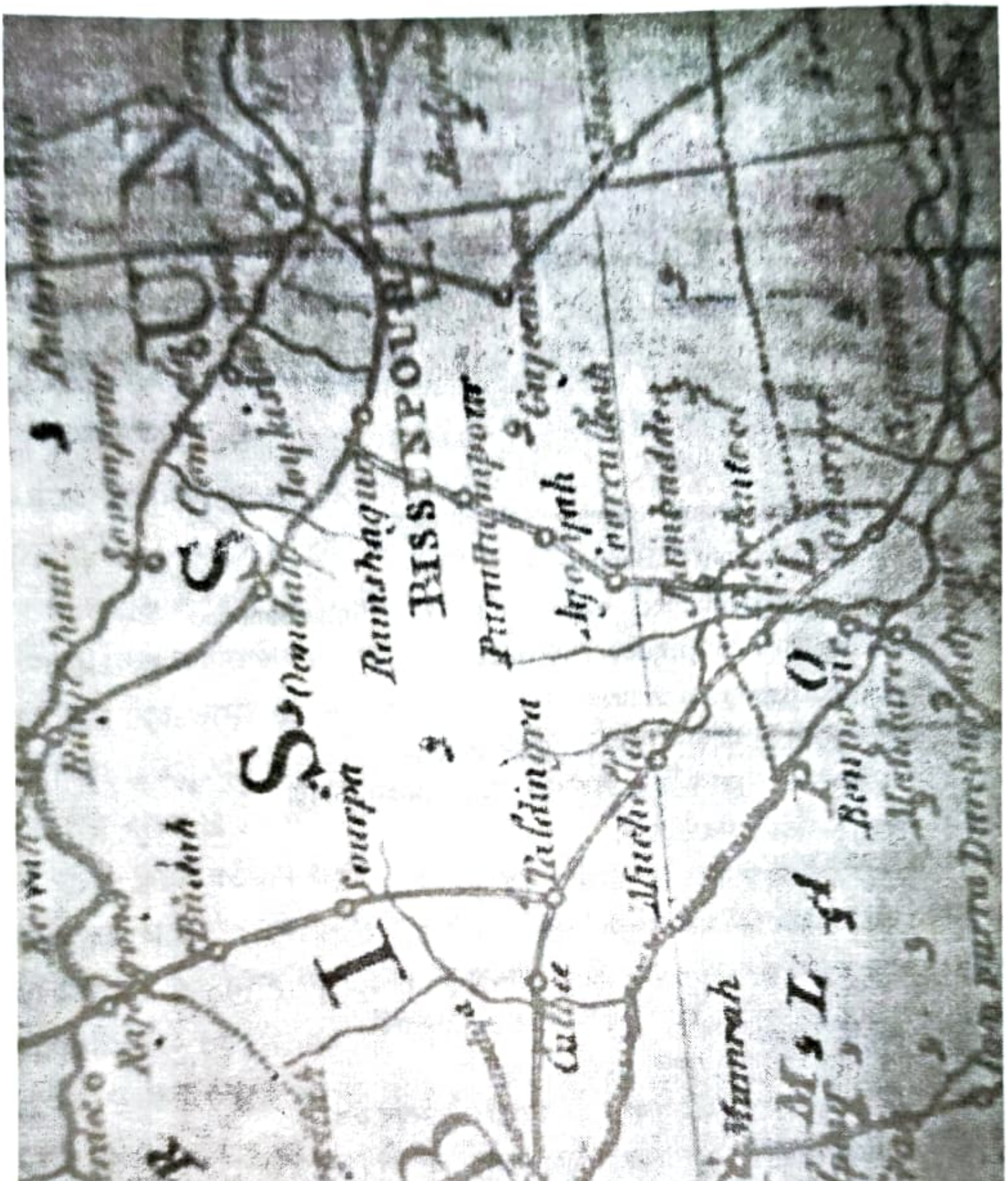
এই শতাব্দীর দুই ও তিনের দশকে বাঁকুড়ায় জনজাগরণ ও দেশমুক্তি আন্দোলন একমাত্র মেদিনীপুর জেলার সাথেই তুলনীয়। মহাত্মা গান্ধী সহ বিভিন্ন দেশনেতা ও রাজ্যনেতা এসময় বাঁকুড়া সফর করে আন্দোলনে তীব্রতা আনেন। বিপ্লববাদীদের সমান্তরাল আন্দোলন তীব্রতা পায় তিনের দশকে। ১৯৩০ খ্রীঃ থেকে ১৯৩৫ খ্রীঃ মধ্যে বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসক নেপাল সেন, জেলা পুলিশ সুপার বি সি দাশগুপ্ত, লাটসাহেব আন্ডারসনকে হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।

ব্রিটিশ বাঁকুড়ায় শেষ চারের দশক ছিল রাজনৈতিক বহুত্ববাদ বিকাশের সময়কাল। কংগ্রেসী মতাদর্শ ছাড়াও হিন্দুত্ববাদী ও লিগপন্থী মতবাদ বিস্তার লাভ করে এ সময়। বিশেষত বাঁকুড়া ও ওন্দা থানা এলাকায়। সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীরা বাঁকুড়ার বিভিন্ন স্থানে সভা করে তাঁদের মতাদর্শ প্রচার করেন। বামপন্থী নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক জাগরণও ছিল সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রবাহের একটি দিক।

দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৫ আগষ্ট দেশের অন্যান্য অংশের মত বাঁকুড়াও পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পায়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে অস্তমিত স্বাধীনতা সূর্যের পুনরোদয় ঘটে।

তথ্যসূত্র ঃ

১) The Annals of Rural Bengal – W.W. Hunter
২) Statistical Account of Bengal – W.W. Hunter
৩) Bankura District Letters Issued 1802-1869 – Sinha-Banerjee
৪) Bankura District Gazetters : O' Malley
৫) Bankura District Gazzetters : A K Bandyopadhyay
৬) বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি — রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী
৭) নয়া বাঁকুড়ার গোড়াপত্তন ও বিকাশ — রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী
৮) বাঁকুড়া — তরুণদেব ভট্টাচার্য
৯) বাঁকুড়া জেলার বিবরণ — রামানুজ কর
১০) বাঁকুড়া পরিচয় — মানিকলাল সিংহ
১১) বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ, অনটন এবং ত্রাণ ঃ শ্যামসুন্দর শুকুল
১২) বাঁকুড়ার ঐতিহাসিক ইমারত ঃ গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী
১৩) পশ্চিমবঙ্গ ঃ বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা
১৪) পশ্চিমরাঢ় গবেষণা সাময়িকী ঃ ২য় সংখ্যা (ডিসেম্বর'০৩)
১৫) বাঁকুড়ার খেয়ালী ঃ সম্পাদক গিরীন্দ্র শেখর চক্রবর্তী (জুন'০৭)
১৬) পশ্চিমরাঢ় গবেষণা সাময়িকী ঃ ১ম সংখ্যা (এপ্রিল'২০০৩)
১৭) বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ঃ সুব্রত রায়
১৮) সাত দশকের কথামালা ঃ তুষারকান্তি ঘোষ
১৯) আত্মপরিচয় ঃ বাঁকুড়া-১ ব্লক (পঃ সঃ প্রকাশিত)
২০) জেলা শাসকের করণ ঃ বাঁকুড়া
২১) আই সি ঃ বাঁকুড়া সদর থানা
২২) বিষ্ণুপুর পুরসভা
২৩) সোনামুখী পৌরসভা
২৪) জেলা আদালত ঃ বাঁকুড়া



বাঁকুড়ার প্রথম সার্ভেয়ার মেজর জেমস রেনেল সাহেবের তৈরী করা মানচিত্রের অংশ বিশেষ (সময়কাল ১৭৮০-৮৩) — মানচিত্রে বিষ্ণুপুর (১), ওন্দা (২), রামসাগর (৩), বাঁকুড়া (৪) সহ অন্যান্য স্থানগুলি চিহ্নিত।

পরিশিষ্ট

বাঁকুড়ার কয়েকজন জেলাশাসক ঃ—

■ **রমেশচন্দ্র দত্ত ঃ**

রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৪৮ খ্রীঃ ১৩ই আগষ্ট কোলকাতা শহরে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা ঈশানচন্দ্র দত্ত ছিলেন একজন ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট। মাতার নাম থাকমণি। পিতার বিভিন্ন জেলায় কর্মসূত্রে থাকার কারণে রমেশচন্দ্র সংশ্লিষ্ট জেলা স্কুলগুলিতে পড়াশুনা শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৬৪ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেখানে বি. এ. পড়ার সময়ে বাড়ীর অমতে আই. সি. এস পরীক্ষায় বসার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড পাড়ি দেন ১৮৬৮ খ্রীঃ। উল্লেখ্য ১৮৬৩ খ্রীঃ ইংল্যাণ্ডে আই. সি. এস পরীক্ষা চালু হলে পরবর্তী প্রথম দলেই ভারতীয়রা বিশেষত বাঙালীরা ভাল সংখ্যায় এই পরীক্ষায় সাফল্য



পায় এবং প্রশাসনে ইংরেজদের এতদিনকার আধিপত্যের অবসান ঘটে। লণ্ডনে থাকাকালীন ইউনিভার্সিটি কলেজে ইংরাজী সাহিত্য ও মিডিল টেম্পল কলেজে আইন নিয়ে পড়াশুনা করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ তিনি আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৭১ খ্রীঃ আলিপুরে এসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ নদীয়ার মেহেরপুর ও ১৮৭৬ খ্রীঃ ভোলা জেলার দক্ষিন সাহাবাজপুরে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও সাইক্লোন হয় তার ত্রাণ ও পুণঃগঠনের দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেন। ১৮৮০-৮১ খ্রীঃ তিনি নবগঠিত বাঁকুড়া জেলার প্রথম জেলাশাসক

হিসাবে প্রথম দায়িত্বভার নেন। পরবর্তীকালে তিনি বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিং, বর্ধমান, দানাপুর, মেদিনীপুর জেলার ন্যাস্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার দায়িত্ব পালনের পর, ১৮৯৪ খ্রীঃ বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনার, ১৮৯৫ খ্রীঃ ওড়িষা ডিভিসনের কমিশনার নিযুক্ত হন।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে ১৮৯২ খ্রীঃ তিনি Companionship of the Indian Empire সম্মানে ভূষিত হলেও, ব্রিটিশ সরকারের ভূমি ও ভূমিকর নীতি ও শিল্পনীতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। প্রকৃত কৃষকের ভূমি স্বত্ত্ব সুনিশ্চিত করতে না পারাতে তিনি ব্রিটিশ ভূমি নীতির বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে অযৌক্তিক ভূমি কর ছিল কৃষকের স্বার্থ বিরোধী। এর ফলে যেমন কৃষকের পক্ষে সঞ্চয় করা অসম্ভব ছিল তেমনি প্রায়শ তারা দুর্ভিক্ষ কবলিত হতেন। বাঁকুড়ায় থাকাকালীন তিনি নির্বিচার বনভূমির ধ্বংসের পাশাপাশি পূর্বোক্ত বিষয়গুলিকে তিনি দুর্ভিক্ষের কারণ বলে মনে করতেন। পাশাপাশি ব্রিটিশ বাণিজ্য ও শিল্পের আগ্রাসনে দেশীয় শিল্প ও লক্ষ লক্ষ শিল্পীর জীবিকা ধ্বংসের বিষয়েও সোচ্চার ছিলেন। তাঁর মতে "India in the eighteenth century was a great manufacturing as well as great agricultural country, and the products of the Indian loom supplied the markets of Asia and Europe. It is unfortunately, true that the East Indian Company and the British Parliament.... discouraged Indian manufactures in the early years of British rule in order to encourage the rising manufactures of England... millions of Indian artisans lost their earnings; the population of India lost one great source of their wealth."

১৮৯৭ খ্রীঃ মাত্র ৪৯ বছর বয়সেই তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯০৪-০৭ খ্রীঃ সময়ে তিনি বরোদা রাজের রাজস্ব মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। ১৯০৮ খ্রীঃ তিনি Decentralisation Commission এর সদস্য মনোনীত হন। ১৮৯৪ খ্রীঃ বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনন্য প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি হন। উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন পরিষদের সহ সভাপতি। ১৮৯৯ খ্রীঃ তিনি ভারতীয়

জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অর্থনীতি, কাব্য, সাহিত্য জগতের এই কৃতি সন্তান ও দক্ষ প্রকাশক ১৯০৯ খ্রীঃ ৩০ শে নভেম্বর পরলোকগমন করেন।

■ **গুরুসদয় দত্ত ঃ**

১৮৮২ খ্রীঃ ১০ই মে সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার বিরাসরি গ্রামে গুরুসদয় দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজ ও বিপর্যয়কালীন ত্রাণ কাজে অংশ নিতেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান ও প্রেসিডেন্সি কলেজের এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করেন (১৯০১ খ্রী)। এরপর তিনি কেমব্রিজের এমানুয়েল কলেজে অধ্যয়ন শুরু করেন ও ১৯০৫ খ্রীঃ আই. সি. এস পরীক্ষায় সাফল্য পান (প্রথম পর্যায়ে সপ্তম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান)। এরপর তিনি আরা, হুগলী, পাবনা, বগুড়া, যশোর, ফরিদপুর, কুমিল্যা, ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, বীরভূম, বাঁকুড়া, ময়মনসিং জেলার বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

গুরুসদয় অন্যান্য ব্রিটিশ প্রশাসকদের মতো প্রথাগত দায়িত্ব পালনে আবদ্ধ না থেকে দারিদ্র দূরীকরণ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৯১৩ খ্রীঃ পাবনার জেলাশাসক থাকার সময় জেলাব্যাপী নারী শিক্ষা বিস্তারে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বহুসংখ্যক মহিলা সমিতি গড়ে তোলেন। এ কাজে তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী সরোজনলিনী দত্তের সক্রিয় যোগদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

নারীমুক্তি আন্দোলনের তিনি যেমন ছিলেন পথপ্রদর্শক তেমনি ১৯১৮ খ্রীঃ বীরভূমের জেলাশাসক থাকাকালীন গ্রামীন পুনর্গঠন আন্দোলন গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে বাঁকুড়া, হাওড়া, ময়মনসিং জেলার জেলাশাসক থাকাকালীন তাঁর এই কর্মধারা অব্যাহত থাকে। জেলাশাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি জল সংরক্ষনের জন্য কচুরীপানা অপসারন ও মজে যাওয়া খাল সংস্কারে শ্রমিকদের সাথে কজে হাত লাগান।

১৯২২ খ্রীঃ বাঁকুড়ার জেলা শাসক থাকাকালে তিনি জলের সঠিক ব্যাবহার ও সেচ ব্যাবস্থার সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সেচ সমবায় সমিতি গঠন করেন। এ সময় তালডাংরার আমজোড় ও রুক্মিনী খাল সহ বিভিন্ন সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এবছরই তাঁর উদ্যোগে কৃষি উন্নয়নে বাঁকুড়া শহরে ২৯ একরের কৃষি খামার প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষকদের উৎসাহিত করতে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উপস্থিতিতে ১৯২২

সালে কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। তাঁর উদ্যোগে গঠিত জেলা কৃষি ও হিতসাধনী সমিতির কাজ লর্ড লিটন কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল।

গুরুসদয় দত্ত নারী শিক্ষা, বিশেষত অপ্রথাগত শিক্ষার প্রসার প্রয়াসে ১৯২৫ খ্রীঃ সরোজনলিনী দত্ত মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশন নামক একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতি-নৃত্যকলা গীতকে বাঁচিয়ে রেখে জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রসারে ১৯৩২ খ্রীঃ তিনি ব্রতচারী আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর ভাষায় এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল "the movement is to bring back to humanity, in all countries, the ideal and practice of the wholeness of life which, alike in the indivisual, the national and international sphere has been so grievously shattered in the modern world in every country by the fragmentary outlook on, and treatment of, life in education, science work, play and social functioning."

এই স্বাধীনচেতা ও জাতীয়তাবাদী প্রশাসকের সাথে ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন সময়ে মতবিরোধ ও সংঘাত তৈরী হয়েছে। ১৯২৮ খ্রীঃ তিনি যখন হাওড়ার জেলাশাসক ছিলেন, বামনগাছিতে সমবেত জনতার উপর পুলিশের গুলি চালনার তিনি তীব্র নিন্দা করেন। রুষ্ট ব্রিটিশ সরকার ভারত সচিব লর্ড বিরকেনহেডের কাছে রিপোর্ট তলব করে ও হাউস অব লর্ডসে বিষয়টি আলোচিত হয়। তাঁকে ময়মনসিং জেলায় বদলি করে দেওয়া হয়। মহাত্মাগান্ধীর ডাকে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হলে জেলা শাসক হিসাবে মনমনসিং জেলার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে তিনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করেন। তাঁকে টেলিগ্রাম মারফত নির্দেশে দ্রুত বীরভূমে বদলী করে দেওয়া হয়।

এই জন দরদী দক্ষ প্রশাসকের মাত্র ৫৯ বছর বয়সে ১৯৪১ সালের ২৫ শে জুন মৃত্যু হয়।

■ বি. ডি. হাজরা (ব্রজদুর্লভ হাজরা) ঃ

১২৭৬ সালে ২০ ভাদ্র বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার রামসাগরে বি. ডি. হাজরার জন্ম। চুঁচুড়া স্কুল হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান দখল করে বি. এ. পাশ করেন। এম. এ

ও আইন পড়ার সময় তাঁর শিক্ষক রাসবিহারী ঘোষ তাঁকে সদ্য চালু হওয়া বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে বলেন। চাকুরিতে অনিচ্ছা থাকলেও শিক্ষক রাসবিহারীর পরামর্শ মত তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী গ্রহণ করেন।

কর্মজীবনে তিনি বাঙ্গলা, বিহার, ওড়িশার বিভিন্ন জেলায় কাজ করেন। কুমিল্লা, বীরভূম, বাঁকুড়া সহ বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। নিজ জেলায় বদলী করার সরকারী নিয়ম না থাকলেও, বি ডি হাজরার প্রশাসনিক দক্ষতা ও কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বাঁকুড়ার জেলাশাসক নিযুক্ত করে (১৯২৩-১৯২৪ খ্রীঃ)। এই নিয়োগ বিতর্কে তৎকালীন মুখ্যসচিব মিষ্টার কলি লিখেছেন, "নিজ জেলা হইলেও তিনি নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা হইতে বিচ্যুত হইবেন না বা স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিব্রত বোধ করিবেন না এ বিষয়ে গভর্নমেন্ট নিঃসন্দেহ।"

কর্মজীবনে ব্রজদুর্লভ হাজরার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য প্রায়শই সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ হত। স্যার উইলিয়াম প্রেন্‌টিসের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হয়েছিল। এই প্রেন্‌টিশ পরবর্তীকালে সরকারের মুখ্যসচিব হয়েছিলেন। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য যিনি বি ডি হাজরার সঙ্গে একই সময়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগ দেন, স্মৃতি কথায় লিখেছিলেন, "It was an evil day when Braja Durlabha Hajara and I decided to join the Bengal Civil Service.

মানুষের প্রতি দরদী মন তাঁকে মানুষের জন্য কাজ করতে প্রাণিত করে। তিনি জেলাশাসক থাকাকালে ওন্দার বিড়াই খাল প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন শ্রী রাখাল রাজ দে। তাঁর সময়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনে আসেন গভর্ণর লর্ড লিটন। জেলা কৃষি ও হিতসাধনী সমিতি, সেচ সমবায়গুলির কাজকর্মের পর্যালোচনা ছাড়াও তিনি তালডাংরার আমজোড়-রুক্মিনী খালের সংস্কার কার্য্য ও পুনিশোলের রেশমগুটি প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তাঁর পরিদর্শন প্রতিবেদন থেকেই ব্রজদুর্লভের সময়কার উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কে অনুমান করা যায়। লিটন লিখেছিলেন, "অনাবৃষ্টির জন্য শষ্য না জন্মালে যে ভীষণ বিপদ ঘটে, তা সমাধান করার জন্য নিজগ্রামে সেচ সমবায় সমিতিগুলি যে কাজ করছে তা অত্যন্ত উৎসাহজনক। দরিদ্র শ্রেণীর লোক ও কীরূপ সমৃদ্ধি ও সম্পত্তি অর্জন করতে পারে, এই সকল সমিতির সভ্যরা তা দেখিয়েছেন। এবং জেলার ভবিষ্যতের পক্ষে এটি আশাব্যঞ্জক...। এদের প্রশংসনীয় উদ্যোগকে আমি মনে রাখব এবং এই উদ্যোগকে

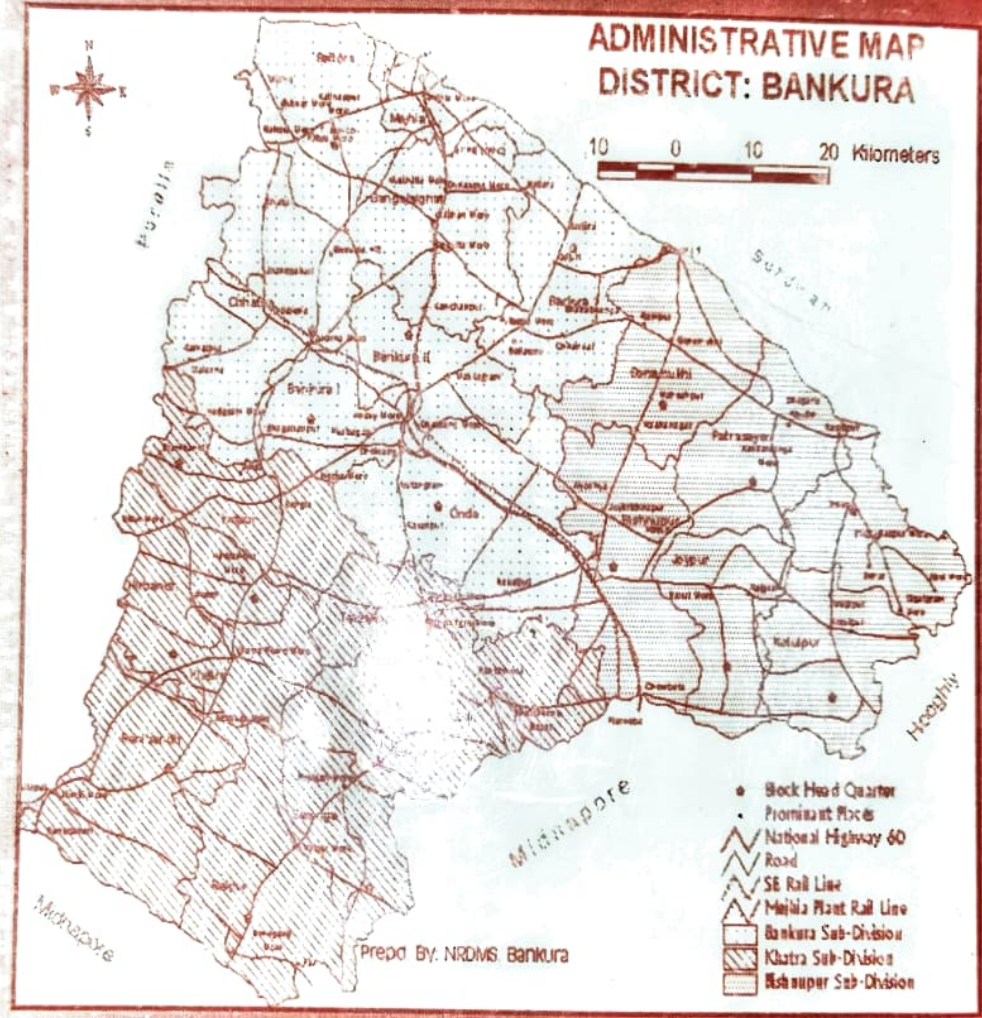
যাতে যথার্থ উৎসাহ দেওয়া হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখব।.... জেলার কৃষি ও হিতসাধনী সভার কাজের বিষয়টিও জেনেছি, যা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ধন্য তাদের চেষ্টা, ২৬০০০ বিঘা জমি- যেখানে অনাবৃষ্টি জনিত শষ্যহানি ছিল স্বাভাবিক, এখন সেই বিশাল পরিমাণ জমি সে অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা পেয়েছে।"

ব্যক্তিমানুষ হিসাবেও বিভিন্ন গ্রামের উন্নয়নে তিনি কাজ করে গেছেন। রামসাগরে রেলস্টেশন, পোষ্ট অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয় অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে।

গ্রামের প্রতি ভালবাসা থেকে আজীবন গ্রামে কাটিয়ে ৭৫ বছর বয়সে তাঁর মহাপ্রয়াণ হয় রামসাগর গ্রামেই........



বাঁকুড়া জেলার প্রথম সার্ভেয়ার (১৯৮০-৮৩) মেজর জেমস্ রেনেল।


ADMINISTRATIVE MAP
DISTRICT: BANKURA
10 0 10 20 Kilometers
N
S
W
E
Purulia
Burdwan
Hooghly
Midnapore
Midnapore
Block Head Quarter
Prominant Places
National Highway 60
Road
SE Rail Line
Mejhia Plant Rail Line
Bankura Sub-Division
Khatra Sub-Division
Bishnupur Sub-Division
Prepd By: NRDMS Bankura